শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

প্রকাশক :
শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, দি মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি।
~~৩, গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট,~~
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশন : আষাঢ়, ১৩৩৩
দ্বিতীয় মুদ্রণ : পৌষ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর : শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ
নিউ ঘোষ প্রেস
৪/১ই বিডন রো
কলিকাতা—৬

প্রথম প্রকাশকের নিবেদন

পরিচয়

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীর তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে স্বামীজীর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ হইতে লণ্ডনে গমন পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আলমবাজার মঠের অবস্থা ও ভারতবর্ষের জাগরণের আভাষও দেওয়া হইয়াছে। আমেরিকায় যাইয়া স্বামীজীকে কিরূপে নানা সম্প্রদায়ের সহিত বিবাদ করিতে হইয়াছিল তাহাই পাঠক এই পুস্তক পাঠে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। শক্তির বিকাশ করিতে হইলে কিরূপ তপস্যার প্রয়োজন হয় এবং সেই তপস্যা-সঞ্চিত শক্তি কিরূপে নানা বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ করাইয়া মানবকে স্বীয় অভীষ্ট বস্তু লাভ করাইয়া দেয় সেই বিষয় পাঠক স্বামীজীর জীবনী পাঠে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবেন। ভারতবর্ষে আবহমান কাল হইতে দুইটি বাণী সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে—শ্রদ্ধা ও তপস্যা। যে কোন অবতার বা মহাপুরুষ বা লেখক হউন না কেন, তাঁহারা মানবেব ভিতর এই শ্রদ্ধা ও তপস্যার ভাব উদ্ভূত করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াছেন। এই শ্রদ্ধা ও তপস্যাব উপর জীব বা জাতীয় জীবন নির্ভর করে। যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে, যেদিন হইতে ভারতবাসী নিজেদের উপর শ্রদ্ধা হারাইলেন সেইদিন হইতে তাহাদের অধঃ-পতনের সূত্রপাত হইল। বুদ্ধদেবের পর হইতে সমস্ত ভারতবর্ষের ভিতর ভারতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার মত মহাপুরুষ এক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ব্যতীত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। অবশ্য নানা স্থানে মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল সত্য কিন্তু তাঁহাদের ভিতর কেহই সমস্ত ভারতবর্ষের ভিতর প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ পান নাই। ভারতবর্ষের যে একটি মহান্ বিরাট সভ্যতা আছে এবং তাহার নিকট হইতে অন্যান্য জাতির যে বিশেষ শিক্ষালাভ করিবার জিনিস আছে, সেই বিষয়টি জগৎসভার সমক্ষে সগর্বে সিংহবিক্রমে প্রচার করিবার শক্তি একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে দেখিতে পাই। আমি এইস্থলে আমার নিজের মত প্রকাশ করিলাম। আমার নিজের পূর্ণ বিশ্বাস যে বর্তমান-ভারতের সমস্যা সমাধান করিবার একমাত্র জীবনী—স্বামী বিবেকানন্দ।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের লোকের ভিতর একটি মহা বিষাদ ও নৈরাশ্যের ভাব লক্ষিত হইত, তখন ব্যক্তিত্ব বা জাতিত্ব বলিয়া বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু স্বামীজীর অদ্ভুত ব্যক্তিত্বই প্রথম জাতিত্বকে প্রণয়ন করিল। বস্তুতঃ স্বামীজীর আগমনের পর হইতেই ভারতবর্ষের ভিতর জাতীয় ভাব প্রথম প্রস্ফুটিত হইল। এই পুস্তক প্রকাশে যদি জ্ঞানী, ধ্যানী ও কর্মীর কিছুমাত্রও উপকার হয় তাহা হইলেই শ্রম সফল হইল মনে করিব।

কলিকাতা
১০ই আষাঢ়, ১৩৩৩

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। অল্পকাল পরে তিন খণ্ডের যাবতীয় গ্রন্থ নিঃশেষিত হইয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের পরিমার্জিত সংস্করণ যথাক্রমে ১৩৬৩ ও ১৩৬৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে পূজনীয় গ্রন্থকার প্রথম খণ্ডের প্রাক্‌বাণীতে যাহা বলিয়াছেন পাঠকের জ্ঞাতব্য বিবেচনায় তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইল ঃ

"......১৯২৩।২৪ খৃষ্টাব্দে শীতকালে কনখলে অবস্থান কালে আশ্রমে বিনয় পিটক, জাতক ও অপরাপর বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পাঠ করা হইতেছিল। সেই সময় এই গ্রন্থখানি লিখিবার প্রয়াস হয়; এই জন্য এই গ্রন্থে অনেক পরিমাণে বিনয় পিটক বা জাতকের রীতি অনুসৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে যে সকল ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে, অধিকস্থলে বর্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন; যেগুলি কোন বিশিষ্ট লোকের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে।"

"......জীবনী বা ইতিহাস অনেক লিখিত আছে এবং তাহা প্রায় এক জনেরই হইয়া থাকে। কিন্তু এই গ্রন্থ জীবনী বা ইতিহাস নহে, ইহাকে Annals বা ঘটনাবলী বলে। যতদূর সম্ভব ঘটনাগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তবে পারম্পর্য বা নির্ধারিত সময় দেওয়া হয় নাই, কারণ এ স্থলে তাহার কোন আবশ্যক নাই। ঘটনাগুলিতে নিজের কোন মত প্রকাশ করা হয় নাই, পাঠ করিয়া যিনি যাহা বুঝিবেন সেইরূপ মীমাংসা করিবেন......"

লক্ষ্যহীন ভ্রমি ধরা মাঝে
উত্তাল তরঙ্গ রাশি—
গ্রাসিছে জগৎ।
হাহাকার সাদা উঠে রোল।
মর্ম্ম ভেদী পশিছে
হৃদয় মাঝে,
নাহিক নিস্তার!
কে আছ মানব
নিবার তরঙ্গরাজি।

—পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

উৎসর্গ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যিনি অন্তরঙ্গ ছিলেন, গুরু-সেবার যিনি প্রত্যক্ষ-মূর্তি ছিলেন, যাঁহার ভক্তি, জ্ঞান, বিদ্যা ও ভালবাসা অতি উচ্চভাবে বিকশিত হইয়াছিল, যাঁহার ওজস্বিতায় ও গুরু-নিষ্ঠায় সকলে মোহিত হইয়াছিলেন,

শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজীর

পবিত্র স্মৃতিকল্পে এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র



নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র জননী

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী দাসী

শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী

স্বামীজীর জাপান যাত্রা

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীজী P. & O. Co. এর S. S. Peninsula-নামক ষ্টীমারে করিয়া জাপান যাত্রা করিলেন। সপ্তাহকাল মধ্যে জাহাজ কলম্বো বন্দরে পৌঁছিল এবং সমস্তদিন জাহাজ তথায় রহিল। সেই অবসরে স্বামীজী জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া সহরটি দেখিয়া লইলেন। এই স্থানের একটি বৌদ্ধ মন্দিরে তিনি গিয়াছিলেন। তাহার পর জাহাজ মালয়ের রাজধানী পেনাং ও পরে সিঙ্গাপুর হইয়া হংকং বন্দরে পৌঁছিল। হংকং সহরে স্বামীজী তিন দিন ছিলেন এবং ক্যাণ্টন দেখিতে গিয়াছিলেন। বিদেশীকে Foreign devil (বিদেশী দানব) বলিয়া থাকে কিন্তু স্বামীজী সন্ন্যাসী ও ভারতবর্ষ হইতে যাইতেছেন বলিয়া তাহারা একটু সম্মান দেখাইয়াছিল। ক্যাণ্টন হইতে তিনি আবার হংকং-এ ফিরিলেন এবং তথা হইতে জাপানে পৌঁছিলেন। এই স্থানে স্বামীজী জাহাজ পরিবর্তন করিলেন এবং তৎসঙ্গে জাপানের কয়েকটি সহরও দেখিয়া লইলেন। জাপান হইতে তিনি খেতড়ির রাজা অজিত সিংকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন এবং তাহাতে জাপানের শিল্পকার্য ও জাতিগত উন্নতির বিষয় বিশদভাবে লিখিত ছিল। খেতড়ির রাজা অজিত সিং সেই সকল পত্র নিজের নিকট রাখিয়া দিয়া তাহার নকল করিয়া বর্তমান লেখককে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিতেন এবং সেই সকল পত্র পড়িয়া সকলে আনন্দিত হইতেন। ইয়োকোহামা হইতে স্বামীজী পুনরায় জাহাজে উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া একেবারে ভ্যাঙ্কুবরে চলিয়া যান। যদিও সময়টা গরম কাল ছিল কিন্তু ভ্যাঙ্কুবরে তখন বেশ ঠাণ্ডা ছিল। আলাসিঙ্গা প্রভৃতিরা যে সকল পরিচ্ছদ তৈয়ারি

করিয়া দিয়াছিল সেই সকল পোষাক গরম দেশের উপযোগী ছিল, শীতপ্রধান দেশে গরমকালেও তাহা ব্যবহার করা চলে না, সেইজন্য স্বামীজী শীতার্ত হইয়া কষ্ট পাইয়াছিলেন।

স্বামীজীকে জাহাজের কাপ্তেনের ক্লোক পরাইয়া দেওয়া—জাহাজের কাপ্তেন স্বামীজীর কষ্ট বুঝিতে পারিয়া নিজের গরম ক্লোক ইত্যাদি স্বামীজীকে পরাইয়া দিলেন। বোম্বাই ছাড়িয়া যাইবার পর ভারতবর্ষীয় ইংরাজেরা স্বামীজীর প্রতি একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছিল কিন্তু কলম্বো ও অন্যান্য বন্দর হইতে যে সকল ইংরাজ জাহাজে উঠিলেন তাঁহারা বেশ সহজ সরলভাবে স্বামীজীর সহিত নানা বিষয় কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। স্বামীজী রাজা সাহেবকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, "এ সকল ইংরাজ তাজা বিলাতী এজন্য ইহারা ভারতবাসীকে অবজ্ঞা করে না।" জাহাজে স্বামীজীকে অনবরত নানা বিষয়ক কথাবার্তা কহিতে হইত এবং তিনি বেশ একটি আত্মগোষ্ঠী করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম শ্রেণীর আরোহী, এইজন্য চা ও কফি বলিবামাত্র আনিয়া দিত। সুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই জাহাজে ছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে তিনি টাটাকে বলিয়াছিলেন, "জাপান থেকে দেশলাই নিয়ে গিয়ে দেশে বিক্রয় করে জাপানকে টাকা দিচ্ছ কেন? তুমি ত সামান্য কিছু দস্তুরী পাও মাত্র; এর চেয়ে দেশে দেশলাইয়ের কারখানা করলে তোমরাও লাভ হবে, দশটা লোকেরও প্রতিপালন হবে এবং দেশের টাকা দেশে থাকবে।" কিন্তু টাটা সে প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া নানারূপ আপত্তি দর্শাইতে লাগিলেন। সে সময় টাটার জাপানি দেশলাই একচেটিয়া ছিল।

স্বামীজীর রাজা অজিত সিংকে পত্র লেখা—স্বামীজী রাজা সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, "আগে দিনতে লোটা হাতে করে ২৫ বার পাইখানা যেতে হত কিন্তু জাহাজে আসা অবধি (তাঁহার) পেটটা বেশ ভাল হয়ে গেছে, অতবার আর পায়খানায় যেতে হয় না।" জাপান হইতে লেশ কিনিয়া স্বামীজী রাজা সাহেবকে পাঠাইয়াছিলেন

এবং লিখিলেন, "টাকাটা ব্যাঙ্কের মারফৎ একেবারে আমেরিকায় চলে গিয়েছে নচেৎ যদি টাকাটা আমার হাতে থাকত তা'হলে জাপানের শিল্পকার্য ক্রয় করে দেশে ফিরে যেতাম, আমেরিকা যাবার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করতাম।"

ভ্যাঙ্কুবর ক্যানাডার দক্ষিণ পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি স্থান। ভ্যাঙ্কুবর হইতে স্বামীজী রেলে করিয়া ক্যানাডার মধ্য দিয়া চিকাগোয় চলিয়া যান।

যদিও বর্তমান লেখক এ সময় আমেরিকায় উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু কলিকাতায় ও মাদ্রাজে যে সব পত্র আসিত এবং পরে উপস্থিত লোকদিগের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই কিঞ্চিৎ নিম্নে প্রদান করিলেন।

স্বামীজীর চিকাগোয় গমন—ভ্যাঙ্কুবর হইতে স্বামীজী চিকাগোয় পৌঁছিলেন এবং একটি হোটেলে গিয়া উঠিলেন। তখন চিকাগো সহরে Worlds Fair নামক এক বিরাট প্রদর্শনী বসিয়াছে। নানা স্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট লোক তাহা দেখিবার জন্য তথায় আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ভিতর তিনি নিজের পরিচিত কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। স্বামীজী মাঝে মাঝে প্রদর্শনী দেখিতে যাইতেন। স্বামীজীর অদ্ভুত রকমের বেশ দেখিয়া সকলে তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল এবং সাধারণ লোকে বিদ্রূপ ঠাট্টাও করিয়াছিল। সেই প্রদর্শনীতে একটি মহারাষ্ট্রীয়, ভারতীয় ফিতা এবং অন্যান্য জিনিসপত্র লইয়া দোকান করিয়াছিল। লোকটি অতি মুখর প্রকৃতির ছিল। বরোদার মহারাজাও সেই সময় প্রদর্শনী দেখিতে যান। দর্শকবৃন্দ সেই মহারাষ্ট্রীয় লোকটিকে বরোদার মহারাজের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই লোকটি বরোদার মহারাজের ও ভারতবর্ষীয়দের সম্বন্ধে নানারূপ গ্লানি ও নিন্দা করিয়াছিল। পরদিন সংবাদ পত্রে প্রকাশ হইল যে স্বামীজী এই সমস্ত কথা বলিয়াছেন অথচ স্বামীজী সে বিষয়ে কিছুমাত্র জানিতেন না। বর্তমান লেখকের লণ্ডন অবস্থানকালে রাজওয়াড়ি নামক জনৈক

মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি কারবারী লোক ছিলেন এবং জীবনের অধিকাংশ সময় লণ্ডন ও আমেরিকায় অতিবাহিত করিয়াছেন। লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না কিন্তু খুব নির্ভীক ও লোকের মুখের উপর কটুকথা বলিয়া দিতেন—কাহারও বড় খাতির রাখিতেন না। কথাপ্রসঙ্গে পূর্বকথা উল্লেখ করিলে বোঝা যাইল যে রাজওয়াড়ি ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন।

আমেরিকায় স্বামীজীর চঞ্চল ভাব—আমেরিকা ধনীর দেশ, খরচ পত্র অত্যন্ত বেশী। স্বামীজীর হাতে সামান্য মাত্র অর্থ, দিন দিন অত্যন্ত খরচ হইতেছে অথচ কার্যের কোন সুবিধা দেখিতে পাইতেছিলেন না। স্বামীজী জুলাই মাসে চিকাগোয় পৌঁছিলেন কিন্তু ধর্ম মহাসভা বসিবে সেপ্টেম্বর মাসে। তাহার উপর ভালরূপ পরিচয় পত্রাদি না থাকিলে সভার প্রতিনিধিরূপে কেহ নির্বাচিত হইতে পারে না। এ দিকে সভার প্রতিনিধি নির্বাচনের শেষ দিনও গত হইয়াছে। এইরূপ সাত পাঁচ ঘটনায় স্বামীজীর মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তিনি তাঁহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া চঞ্চল হইয়া পড়িলেন এবং নানারূপ উপায় উদ্ভাবন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী চিকাগোয় সামান্য কয়েক দিন থাকিয়া বোষ্টনে চলিয়া যান। বোষ্টন শিক্ষিত লোকদিগের একটি প্রধান কেন্দ্র। চিকাগো হইতে বোষ্টনে তাঁহার খরচ কম হইতে লাগিল কিন্তু তিনি যা টাকা আনিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ খরচ হইয়া যাইতে লাগিল অথচ সম্মুখে কিছু সুবিধাও দেখিতে পাইতেছেন না। স্বামীজী যে সকল পোষাক লইয়া গিয়াছিলেন সে সমস্ত পোষাক তথায় চলিল না, তাহার উপর সম্মুখে শীত আসিতেছে এবং শীতের পোষাক না তৈয়ারি করিলে চলিবে না। একটি চলনসই গোছের পোষাক তৈয়ারি করিতেও ৩০০·০০ টাকার উপর খরচ পড়িবে। এইরূপ সম্মুখে নানারকম অসুবিধা দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া তাঁহার মাদ্রাজী শিষ্যদের লিখিয়াছিলেন, "যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমায় ছয় মাস

এখানে রাখিতে পার, আশা করি সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কাষ্ঠখণ্ড সন্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি—তৎক্ষণাৎ তার করিব। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও।" কারণ উক্ত পত্র মাদ্রাজে পৌছিবার পূর্বেই তাঁহার সম্বল ৬০/৭০ পাউণ্ডে দাঁড়াইল। কিন্তু পরবর্তী পত্রে আবার সুখবর আসিল।

স্বামীজী ও অধ্যাপক রাইট—যাহা হউক তখন হইতে স্বামীজীর সহিত আমেরিকাব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচয় হইতে আরম্ভ হইল। একদিন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ জে. এইচ. রাইট মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর নানাবিধ বিষয় কথাবার্তা হয়। অধ্যাপক রাইট মহাশয় স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞান-গরিমা দেখিয়া আশ্চার্যান্বিত হইয়া স্বামীজীকে ধর্মমহাসভায় হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে আমেবিকান জাতির সহিত পরিচিত হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে সমস্ত অন্তরায়গুলি খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার কোন পরিচয় পত্রও যে নাই তাহাও তিনি জানান। স্বামীজীর পরিচয় পত্রের কথা শুনিয়া অধ্যাপক রাইট মহোদয় বলিলেন, "To ask you Swami for your credentials is like asking the Sum to state its right to shine !" (স্বামীজী আপনার নিকট নিদর্শন চাওয়া আর সূর্যকে তাহার কিরণ দিবার অধিকার কি জিজ্ঞেস করা একই কথা)। অধ্যাপক রাইট মহোদয় স্বামীজীকে ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে পাঠাইবার সমস্ত বন্দোবস্তের ভার লইলেন। অধ্যাপক রাইট মহাশয়ের উক্ত সভায় অনেক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সহিত জানাশুনা ছিল। তিনি প্রতিনিধি সভার সভাপতিকে স্বামীজীর জন্য লিখিলেন, "Here is a man who is more learned than

all our learned professors put together" (আমাদের সকল অধ্যাপকের বিদ্যা এক সঙ্গে করলে যা হয় ইহার বিদ্যা তাব চেয়ে ঢের বেশী)। তাহার পর স্বামীজীর নানারূপ বন্দোবস্ত তিনি করিয়াছিলেন।

স্বামীজী অধ্যাপক রাইটের নিকট হইতে পরিচয় পত্র লইয়া চিকাগো সহরে ফিরিলেন। চিকাগোয় ফিবিয়া স্বামীজীর একটু অসুবিধা হইয়াছিল এবং সেই অসুবিধার ভিতর দিয়া তিনি মিসেস্ হেল নামক মহিলার সহিত পরিচিত হন। মিসেস্ হেল মিঃ জর্জ ডব্লিউ হেল্ নামক চিকাগোর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী। ইহাদেব সহিত স্বামীজীর বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। মিসেস্ হেলই স্বামীজীকে মহাসভার অফিসে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান।

স্বামীজী ও ডাঃ ব্যারোজ—স্বামীজী পরিচয় পত্র লইয়া ডাঃ ব্যারোজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাঃ ব্যারোজ প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহার পর নানা ওজর আপত্তি করেন এবং বলেন যে সকলের জন্য সময় নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে কাহারও সময় হইতে একটু অবসর লইয়া আবার নূতন বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে না। যাহা হউক অনেক বাদানুবাদের পর ১০ মিনিটের সময় স্বামীজীকে দেওয়া হইল। তখন হইতে স্বামীজী মহাসভায় হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে নির্বাচিত হইলেন এবং মহাসভার অন্যান্য প্রাচ্য প্রতিনিধির সহিত একত্রে থাকিতে পাইলেন।

ধর্মমহাসভার উদ্বোধন—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর সোমবার বেলা দশটার সময় চিকাগোর শিল্প-প্রাসাদ (Art Institute) নামক ভবনের হলে (Hall of Columbus) এই ধর্মসভার অধিবেশন হইল। প্রথমে ডাঃ ব্যারোজ (Dr Barrows) মহোদয় দুই চারিটি কথা বলিয়া সভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলে যথারীতি ভগবৎ-প্রার্থনাপূর্বক সভার কার্য আরম্ভ হইল। এই সভায় নানা দেশের ধর্মপ্রচারক মণ্ডলীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায় বিশেষ উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সভায়

রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মনায়ক কার্ডিনাল্ গিবন্স, ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ মজুমদার ও নাগরকার এবং সিংহল হইতে আগত বৌদ্ধ ধর্মপাল, মিসেস এনি বেসান্ট ও প্রফেসর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত বহু সাধু পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে স্বামীজীও উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় উদ্বোধনের পর এক এক জনকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিলেন। সকলেই আপন আপন সম্প্রদায় ও অভিরুচি মত আপন আপন বক্তব্য প্রকাশ করিলেন। ক্রমশঃ স্বামীজীর বক্তৃতার সময় আসিল কিন্তু স্বামীজী লাজুক এবং পূর্বে কখন এইরূপ স্থলে বক্তৃতা করেন নাই, তাহার উপর এই মহাসভায় উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতর কি বলিবেন তাহারও কিছু স্থিরতা নাই, সেইজন্য তিনি সঙ্কোচ করিয়া বলিলেন, "না, এখন নহে।" কিন্তু অবশেষে কিয়ৎক্ষণ পরে বাধ্য হইয়া দাঁড়াইতে হইল। কি বলিবেন তাহারও কিছু স্থিরতা নাই বা জানেনও না। স্বামীজী এ বিষয়ে মাদ্রাজের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "Then I bowed to Devi Saraswati and asked her blessings (তখন আমি দেবী সরস্বতীকে মনে মনে প্রণাম করিয়া আশীর্বাদ ভিক্ষা করিলাম)। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভৃতিকে মনে মনে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম এবং তাহার পর উন্মাদের মত বিভ্রান্ত চিত্তে কি বলিয়াছিলাম তাহার কিছুই জানি না। পাগলের প্রলাপের ন্যায় খানিকক্ষণ বলিয়া যাইলাম কিন্তু নিজে কিছুই জানি না। সভামণ্ডপে আমার মুখ হইতে প্রথম আমেরিকাবাসীদিগকে Sisters and Brothers বলিয়া অভিভাষণ করিতে শুনিয়া সকলে আনন্দে করতালি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর শুনিতে পাইলাম যে ৫০০০ শ্রোতৃবর্গ হইতে আনন্দে করতালি-ধ্বনি চতুর্দিকে হইতেছে তখন মনে বড় ভয় হইল। বিদেশী লোক না জানি কি ভুল করিয়াছি তাইতে সকলে বিদ্রূপ করিতেছে। সভা ভঙ্গ হইলে আপনার আবাসগৃহে ফিরিয়া আসিলাম এবং ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম। পরদিন প্রাতে সংবাদপত্রে দেখিলাম যে

আমার কথা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছে এবং Orange Monk (পীতবসনধারী সন্ন্যাসী) নাম দিয়া সংবাদপত্রে অনেক সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছে।”

স্বামীজীর স্বহস্তে বক্তৃতা লেখা—কার্যনিরূপণমণ্ডলী হইতে আদেশ হইল যে, প্রত্যেক বক্তাকে আপন আপন অভিভাষণ লিখিয়া পড়িতে হইবে কারণ ভবিষ্যতে তাহা মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। স্বামীজী আপন আবাস কক্ষে আসিয়া কি বা লিখিবেন কি বা বলিবেন কিছুরই স্থিরতা করিতে না পারিয়া প্রথমে মনে যাহা উদয় হইতে লাগিল তাহাই উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে কাগজ লইয়া তিনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া পুনরায় সভায় চলিলেন। সভায় বক্তৃতা করা কখন অভ্যাস নাই, তাহারপর স্বাভাবিক লাজুক এই জন্যে বক্তৃতাটি পাঠ করিতে একটু সঙ্কোচ করিয়া আপনাকে সর্বের শেষভাগে ফেলিলেন। তাঁহার বলিবার সময় ১০ মিনিট মাত্র ছিল, প্রবন্ধের কয়েক পৃষ্ঠা পড়িতেই সময় অতিবাহিত হইল। সভাপতির আসন হইতে ঘণ্টার শব্দ হইল, স্বামীজী কাগজটি হাতে করিয়া যেমন বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন অমনি শ্রোতৃবর্গেরা কোলাহল করিয়া মহাআগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল স্বামীজী পুনরায় বলিবার জন্য ১০ মিনিট সময় পাইলেন। কিন্তু ১০ মিনিট উত্তীর্ণ হইলে আবার বসিবার যেমন চেষ্টা করিতে লাগিলেন পুনরায় পূর্বের মত শ্রোতৃবর্গের আগ্রহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। পুনরায় স্বামীজী বলিবার জন্য ৫ মিনিট সময় পাইলেন আবার তাহার পর ৫ মিনিট পাইলেন; মোট সর্বশুদ্ধ ৩০ মিনিট সময় পাইয়াছিলেন। সভামণ্ডপে বোধ হয় দুই চারটি লোক ব্যতীত আর কেহ ৩০ মিনিট সময় পায় নাই।

শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দধ্বনি—৫০০০ শ্রোতৃবর্গ স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া যেন নূতন ভাব, নূতন জগৎ, নূতন আলোক পাইলেন। এমনকি স্বামীজীর বক্তৃতার পর আর কাহারও বক্তৃতা হৃদয়গ্রাহী হইল না এবং সভা ভঙ্গ হইলে সমস্তলোক স্বামীজীর করমর্দন করিবার

জন্য তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। সে এক মহাবিপদ! হস্তের গ্রন্থি বিশ্লেষিত হইয়া যাইতে পারে। অবশেষে এক ব্যক্তি আপনার গাড়িতে স্বামীজীকে লইয়া দ্রুত প্রস্থান করিলেন। সেইদিবস হইতে চিকাগোর সমস্ত লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য মহা উৎসাহিত হইল। বৌদ্ধ ধর্মপাল চিকাগো হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "কাগজে স্বামীজীর প্রতিকৃতি দিয়া রাস্তার স্থানে স্থানে মারিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর একটি শুভদিন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল।"

স্বামীজী ও জনৈকা মহিলাঃ গুরুদাস বা স্বামী অতুলানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের একজন আমেরিকান সন্ন্যাসী শিষ্য। তিনি স্বামীজীকে আমেরিকায় অল্পমাত্র দেখিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বর্তমান লেখককে বলেন, "একদিন স্বামীজী ইজের, লম্বাজামা ও মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া উদ্‌ভ্রান্ত মনে রাস্তার অপর পাশে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সঙ্গে কোন পয়সা নাই, খাবারও কোন সম্ভাবনা নাই তবে যদি কেউ দয়া করিয়া ডাকিয়া খাইতে দেয় তবে আহার হইবে না'হলে উপবাস। রাস্তার অপর পাশের বাড়ি হইত একজন মহিলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন যে একটি বিদেশী লোক উদ্‌ভ্রান্ত মনে রাস্তার অপর পাশে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি কৌতূহলী হইয়া দরজা খুলিয়া অপরিচিত ব্যক্তিকে ডাকিলেন। স্বামীজী তাঁহার ডাক শুনিয়া নিকটে যাইলে তিনি, স্বামীজী ভাল ইংরাজী জানেনা এইরূপ মনে স্থির করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে স্বামীজীর সহিত কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন বুঝিতে পারিলেন যে আগন্তুক ইংরাজী ভাষা ভাল জানেন তখন তিনি হর্ষিত ও আশ্চর্যান্বিত হইয়া স্ত্রীলোকোচিত অল্পবিস্তর কথা কহিতে লাগিলেন। কথাবার্তায় যখন বুঝিতে পারিলেন যে ইনি সাধারণ অপেক্ষা উচ্চভাবের লোক এবং প্রার্থী নহেন, উপদেষ্টা (Teacher) তখন তিনি সমান সমান ভাব ছাড়িয়া বিনীত ও আশ্রিতের ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। তদবধি তিনি স্বামীজীকে বিশেষ সেবা ও

শ্রদ্ধাভক্তি করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বাড়িতে কিছুদিন থাকিবার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর প্রত্যহ তিনবার করিয়া বক্তৃতা করা—সভামণ্ডপে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে রোজই বক্তৃতা হইত। স্বামীজীকে এই সময় পূর্বাহ্নে, অপরাহ্নে ও সায়ংকালে বক্তৃতা করিতে হইত অর্থাৎ প্রত্যহ তিনটি করিয়া বক্তৃতা করিতে হইত এবং কোন কোন স্থলে নিজেও সভাপতি হইয়া বসিতেন। সভার শ্রোতারা যাহাতে চলিয়া না যায় এবং নিবিষ্টচিত্তে সকলের বক্তৃতা শুনে সেইজন্য সভার অধ্যক্ষেরা স্বামীজীর বক্তৃতা সর্বশেষ করাইতেন। কারণ স্বামীজী সকলের প্রিয়, সুপণ্ডিত ও সদ্‌বক্তা এইজন্য অপরের বক্তৃতা কষ্টদায়ক হইলেও স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাঁহারা শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। স্বামীজীকে যে প্রত্যহ তিনটি করিয়া বক্তৃতা করিতে হইত তাহা Parliament of Religion গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে এবং বর্তমান লেখক লণ্ডন অবস্থানকালে সেই সভায় যে সমস্ত আমেরিকান উপস্থিত ছিলেন তাহাদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। এই সভায় সংক্ষিপ্ত-সঙ্কেত-লিপির (Shorthand writing) জন্য বিশেষ লোকের বন্দোবস্ত ছিল না। বক্তৃতাগুলি উপস্থিত মত বলা হইয়াছিল সেইজন্য ঐ সকল বক্তৃতার কোন ছাপান হিসাব নাই, সেই সকল বক্তৃতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে সকলে অনুভব করিতে লাগিলেন যে একজন সংক্ষিপ্ত সংকেত-লিপি-লেখক ব্যক্তির আবশ্যক এবং তাহার পর হইতে একজন আসিয়া লিখিতে লাগিলেন।

বীরচাঁদ গাঁধি ও ধর্মপাল—এই সময়কার এক পত্রে স্বামীজী লিখিয়াছিলেন যে বীরচাঁদ গাঁধি নামক জনৈক গুজরাটি ভদ্রলোক জৈন ধর্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং স্বামীজীর সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার পর আর তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায় না। পণ্ডিত মণিরাম ত্রিবেদী নামক জনৈক গুজরাট দেশীয় পণ্ডিত ইংরাজীতে On Monism বা অদ্বৈতবাদ নামক একটি

প্রবন্ধ লিখিয়া স্বামীজীর হস্তে দিয়াছিলেন। স্বামীজী পত্রে লিখিয়াছিলেন যে প্রবন্ধটি অনেক দীর্ঘ হওয়ার জন্য পাঠ করা হয় নাই। বৌদ্ধ ধর্মপালের বিষয় আমেরিকান সংবাদপত্রে লিখিয়াছিল, "যুবকটি ধীর লাজুক—যেন একটি cloistered nun বা নিভৃত গৃহাভ্যন্তরস্থিত সন্ন্যাসিনী।" লণ্ডন অবস্থানকালে স্বামীজী বৌদ্ধ ধর্মপালের বিষয় বলিতেন, "লোকটি লাজুক, ভালমানুষ কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ জানে না একটু হুজুক করিতে ভালবাসে। ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে বক্তৃতা দিবে বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিত কিন্তু সে বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা বা জানাশুনা ছিল না। ভগবান বুদ্ধ আমাদের দেশের লোক এবং আমাদেরই অবতার কাজেই ভগবান বুদ্ধের সম্মান রক্ষা ও তাঁহার ভাব পাশ্চাত্য দেশে দেখাইবার জন্য আমি নিজেই বক্তৃতা করিতাম এবং ধর্মপালের যাহা উদ্দেশ্য তাহা সফল হইত।"

ধর্মপাল ও বর্তমান লেখক—ধর্মপালের আমেরিকা যাইবার বহু পূর্ব হইতেই বর্তমান লেখকের সহিত বিশেষ পরিচয় ছিল এবং কলিকাতায় Creek Row-এ ধর্মপালের বাড়িতে যাইয়া তাঁহার সহিত তিনি মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করিতেন। ধর্মপাল যখন আমেরিকায় যান তখন হরমোহন মিত্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের লিখিত "রামকৃষ্ণ পরমহংস" নামক প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিয়া চিকাগোতে বিতরণ করিবার জন্য বহু সংখ্যক তাঁহার হস্তে দিয়াছিলেন। ধর্মপাল সেইগুলি লইয়া যাইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহাকেও কিছু দেন এবং নিজেও কিছু বিতরণ করিয়াছিলেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বামীজীকে কেশববাবুর সমাজে ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট পূর্বে দেখিয়াছিলেন সেইজন্য তিনি স্বামীজীকে চিনিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, স্বামীজী একটা কলিকাতার গাইয়ে, ডেপোঁ ছোঁড়া পরে সন্ন্যাসী হইয়াছে, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায় ও ভিক্ষা করিয়া খায়। লেখাপড়া বা ভদ্র আচার ব্যবহার কিছুই জানে না মোটকথা একটা

ভ্যাগাবাণ্ড ছোঁড়া। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ধর্মসভায় একটি মাত্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই একটি পুরাতন বন্ধু চিকাগোতে ছিলেন এবং কেশববাবুর নাম ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে সকলেই জানিতেন সেইজন্য ব্রাহ্ম সমাজকেও নিমন্ত্রণ দেওয়া হইয়াছিল। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আর্থিক অবস্থা তখন তত স্বচ্ছল ছিল না, তাহার উপর তিনি বৃদ্ধও হইয়াছিলেন। এই সময় এক বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুধর্মের উপর বক্তৃতা দিবার জন্য কর্তৃপক্ষেরা নির্বাচন করেন যে চারিটি বক্তৃতা দিতে হইবে, প্রত্যেক বক্তৃতাটির জন্য ১০০০ টাকা পারিতোষিক। স্বামীজী অর্থ লইবেন না এইজন্য নিজে এই বক্তৃতার ভার গ্রহণ না করিয়া কর্তৃপক্ষকে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম উল্লেখ করিয়া দেন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সেই চারটি বক্তৃতা দিয়া চারি হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ফল এই হইল যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় চিকাগোর লোকের নিকট স্বামীজীর বিপক্ষে নানারূপ নিন্দা কুৎসা করিতে লাগিলেন। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন, "ছোঁড়াটা রাস্তায় ভিক্ষে করে খায়, পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, বোধ হয় কোন বিপদে পড়ে এখানে পালিয়ে এসেছে। লোকটা এমনি অসভ্য যে মহিলাদের সুমুখে বসিয়াই চুরুট পান করে, পৌত্তলিক, মূর্তি পূজা করে ও লেখাপড়া কিছুই জানে না।" ইত্যাদি নানা প্রকার কুৎসা প্রচার করিতে লাগিলেন। স্বামীজী লণ্ডন অবস্থানকালে ই. টি. ষ্টার্ডির সহিত এ বিষয়ে মাঝে মাঝে অনেক কথা কহিয়াছিলেন এবং আলমবাজারের মঠের পত্রেও এ বিষয়ে অনেক লিখিয়াছিলেন। স্বামীজী একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "ধর্মপাল লাজুক ও ধীর সেইজন্য এ দেশে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছে এবং সকলে তাহাকে বিশেষ ভালবাসে ও যত্ন করে কিন্তু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অনেক নিন্দা কুৎসা করিতেছে, তা করুক গে। আমরা রামকৃষ্ণের তনয়। করিয়াই বা কি করিবে? মহাশক্তির প্রভাবে তৃণবৎ সব উড়িয়া যাইবে। এই সময় এক মান্দ্রাজী যুবক চিকাগোতে

গিয়াছিলেন। স্বামীজী তাহার বিষয়ে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ছেলেটির মাথার একটু গোল আছে, সে অনেক আবোল তাবোল বকে। সে এ্যাণ্ডিস পাহাড়ের উপর গিয়ে ধ্যান করবে আবার যদি কোন হিংস্র জন্তু আসে, তাহলে সে একটা রিভলবার কাছে রেখে দেবে ইত্যাদি কিন্তু তাহার পর আর সে যুবকের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

স্বামীজীর আত্মগোষ্ঠী ও জে, জে গুড্‌উইন—এই সময় স্বামীজীর বেশ একটি আত্মগোষ্ঠী গঠিত হইল। তাহার ভিতর প্রধান এই কয়েক জনের নাম করা যাইতে পারে—মিসেস্ লেগেট্ (Mrs Leggett) ও তদ্‌ভগ্নী মিস্ জোসেফাইন্ ম্যাকলাউড (Miss Josephine Mac Leod), সারা সি. বুল (Sarah C.Bull) মিস্ ফ্যারমার (Miss Farmer) ইত্যাদি। সকলে একজন সংক্ষিপ্ত-সঙ্কেত-লিপি-লেখকের (Shorthand writer) প্রয়োজন মনে করিলেন সেইজন্য তাহারা সংবাদপত্রে এক সক্ষিপ্ত-লিপি-লেখকের প্রয়োজনে বিজ্ঞাপন দিলেন। এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া অনেক ব্যক্তি কর্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তৎসঙ্গে ইংলণ্ড দেশীয় জে. জে. গুড্‌উইন নামক এক যুবক কর্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। যুবকটি চিকাগো সহরে বিদেশী এবং কিছু রোজগার করিতে পারিলে তাহার দিনপাত হইবে এইরূপ চিন্তা কয়িয়া স্বামীজী গুড্‌উইনকে মনোনীত করিলেন। গুড্‌উইন প্রথম কয়েক সপ্তাহ বৃত্তিভোগী হইয়া কর্ম করিয়াছেন। গুড্‌উইনের প্রাণটা বড় উদার ছিল এবং স্বামীজীর প্রদত্ত বৃত্তি অপর লোক দ্বারা সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া তিনিও বৃত্তি লইবার বাসনা ত্যাগ করিলেন এবং আহ্লাদ সহকারে স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত-সংকেতলিপি-লেখক হইলেন এবং পরে আত্মগোষ্ঠীর ভিতরও পরিগণিত হইলেন। এই যুবক গুড্‌উইন ভবিষ্যতে স্বামীজীর প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন এবং শিষ্যমণ্ডলীর ভিতর একজন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

জর্জ হেলের কন্যার স্বামীজীর পায়ের নখ কাটিয়া দেওয়া— চিকাগোয় অবস্থানকালে স্বামীজী কিছু সময় জর্জ ডব্লিউ, হেল নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির ভবনে বাস করিতেন। স্বামীজী লণ্ডন অবস্থান-কালে হেলের বাড়ির গল্প মাঝে মাঝে বলিতেন। হেল মহোদয়ের দুইটি অল্পবয়স্কা কন্যা ছিল তাহারা স্বামীজীকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। স্বামীজী একদিন কৌতুকচ্ছলে বলিতে লাগিলেন যে এক সময় তাঁহার পায়ের নখ কাটিবার আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি নখ কাটিবার জন্য একটি কন্যার নিকট হইতে একখানি ছুরি চাহিলেন এবং নিজেই নখ কাটিবেন এরূপ স্থির করিলেন। কিন্তু কন্যাটি স্বামীজীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অতি সাগ্রহে পদানত হইয়া মেঝের গালিচার উপর বসিয়া স্বামীজীর জুতা উন্মোচন করিয়া, মোজা খুলিয়া অতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া দুই পায়ের আঙ্গুলের নখ কাটিয়া দিয়া তাহার পর পুনরায় মোজা জুতা পরাইয়া দিয়া উঠিয়া চেয়ারে বসিয়া চাকরভাবে স্বামীজীকে বলিতে লাগিল, "স্বামীজী আমায় এক ডলার মজুরি দিন। কোন নাপ্‌তের দোকানে গেলে এক ডলার দাম দিতে হতো।" এই বলিয়া সে হাস্য করিতে লাগিল। স্বামীজীও কৌতুক করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার যে পা ছুঁতে পেয়েছ আর নখ কাটবার অধিকার পেয়েছ এর জন্য আমায় কি দেবে দাও।" এই বলিয়া উভয়ে খুব আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল। স্বামীজীর এই সময়কার ঠিকানা জর্জ হেলের বাড়িতে হইয়াছিল এবং অনেক চিঠিপত্র ও অভিভাষণের প্রত্যুত্তর জর্জ হেলের বাড়ি হইতে লিখিত হইয়াছিল।

স্বামীজীকে জনৈকা কুমারীর প্রশ্ন করা— স্বামীজী এক সময় এক জায়গায় বক্তৃতা করিতে যান। স্বামীজী একে বিদেশী তাহাতে আবার ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছেন এবং ইংরাজীতে বলিতেছেন সেইজন্য কি বিষয় প্রশ্ন করিতে হইবে শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর অনেকেই তাহা জানিত না, সেইজন্য প্রথম প্রথম অনেকে এলোমেলোভাবে প্রশ্ন করিত। একদিন একটি অল্পবয়স্কা কুমারী স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা

করিল, "স্বামীজী, আপনাদের দেশে ছোট শিশুকে গঙ্গাতে কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করে কেন?" কুমারীটি পাদ্রীদিগের গ্রন্থে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ সব বিষয়ে পড়িয়াছিল সেইজন্য এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল। স্বামীজী মুখ গম্ভীর করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে উত্তর করিলেন, "ছোট মেয়েদের মাংস বেশ নরম কি না সেজন্য কচি কচি মেয়েগুলিকে কুমীরদের দেয়।" এইরূপ উত্তর শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর সকলেই হাসিতে লাগিল এবং কুমারীটিও অপ্রতিভ হইয়া রহিল।

স্বামীজী একবার এক জায়গায় বক্তৃতা দিতে যান। তথায় একটি ধনাঢ্য মহিলা আসিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এখানে কি সাতশত লোকের সভা?" স্বামীজী ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উত্তর করিলেন, "না এটা চৌদ্দশ লোকের সভা।" মহিলাটি সেই কথা শ্রবণ করিয়া অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমেরিকায় সাতশ ধনাঢ্য ঘর আছে তাহারা নিজদিগকে সর্ব শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং সাধারণের সঙ্গে মিশিতে একটু কুণ্ঠিত হন সেই জন্য মহিলাটি এরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

জন পিয়ার ফক্স—জে. জে. গুড উইন বলিতেন যে, আমেরিকাতে যেখানে যত সভা হইয়াছিল তাহার মধ্যে ডেট্রয়েট নগরেতে সর্বাপেক্ষা বড় সভা হইয়াছিল। সেই সভাতে প্রায় পাঁচ হাজার শ্রোতার এক সময়ে সমাবেশ হইয়াছিল এবং বক্তৃতাও খুব সুন্দর হইয়াছিল; তবে কোন্ বক্তৃতাটি কোন্ স্থানে হইয়াছিল তাহা সঠিক করিয়া বলা যায় না। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাটি মুদ্রিত হইয়াছিল এবং জন, পিয়ার ফক্স নামক একটি যুবক এই বক্তৃতার সময় উপস্থিত ছিল। লণ্ডন অবস্থানকালে ফক্স স্বামীজীর নিকট কিছুদিন ছিল এবং সেই সময় সেই মুদ্রিত বক্তৃতাটি বর্তমান লেখককে ফক্স দিয়াছিল কিন্তু বর্তমান লেখক পরে কাহাকে দিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে স্মরণ নাই।

স্বামীজীর গুডউইনের উপর ভালবাসা—স্বামীজী এক সময়ে আমেরিকায় নানা নগরে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এমন কি অনেক সময়ে রেল গাড়িতে আহার নিদ্রা যাইতে হইত। তিনি

বিদ্যুতের ন্যায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বক্তৃতা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং আমেরিকার প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত বেশ সখ্যতা হইয়াছিল। তিনি নিউইয়র্কে গীতা অধ্যয়নের একটি ক্লাস খুলিলেন এই স্থানে স্বামীজী নিয়মিতভাবে গীতা, রাজযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। প্রথম প্রথম তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া মুখে মুখে বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে অনর্গল বলিয়া যাইতেন, তাহার কোন নকল থাকিত না। এইরূপে স্বামীজীর অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা নষ্ট হইয়া যায়। তদ্দর্শনে তাঁহার শিষ্যদের ইচ্ছা হইল একজন রিপোর্টারকে দিয়া ঐগুলি লিখিয়া রাখেন এবং এই সময়ে হইতে জে. জে. গুড্‌উইন স্বামীজীর বক্তৃতার জন্য সাঙ্কেতিক-লিপিকার নিযুক্ত হইলেন। স্বামীজী যেখানে যাইতেন গুড্‌উইন তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন, এক দিনের জন্যও তাঁহার কাছ ছাড়া হইতেন না। তিনি স্বামীজীর সহিত লণ্ডনে ছিলেন। স্বামীজীর মুখে প্রায়ই শুনা যাইত 'My faithful Goodwin,' ভারতবর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। গুড্‌উইনের বিয়োগে স্বামীজী অতিশয় মর্মাহত হইয়া বলিয়াছিলেন, "Now my right hand is gone, my loss is incalculable." (আমার ডান হাত খসিয়া পড়িল আর আমার যে ক্ষতি হইল তাহা বলিবার নয়)। স্বামীজী আমেরিকায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন সেইগুলি আবার লণ্ডনে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া লোকে তাঁহাকে Lightning Orator (বিদ্যুদ্বৎ বক্তা,) Cyclonic Hindu (প্রভঞ্জন সদৃশ হিন্দু) বলিয়া সম্বোধন করিত। কোন কোন সংবাদ পত্রে তাঁহাকে He is an orator by Divine right. He is indeed a prince among men, Orange Monk প্রভৃতি বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিল। স্বামীজী যাঁহাদের অতিথি হইতেন তাঁহারা স্বামীজীর বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া যাইতেন। এই স্থানে একথা কেহ যেন না মনে করেন যে স্বামীজী নির্বিঘ্নে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেন। বক্তৃতা দিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক স্থানে বিপদে

পড়িতে হইয়াছিল এবং পাদ্রীদের অত্যাচারও অনেক সহ্য করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে স্বামীজীকে সপ্তাহের মধ্যে বারো, চৌদ্দ বা ততোধিক বক্তৃতা প্রদান করিতে হইত।

স্বামীজীর সহস্রদ্বীপোদ্যানে বিশ্রাম করা—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত গুরুতর পরিশ্রম করিয়া স্বামীজীর ভাগ্যে বিশ্রাম ঘটিল। সেণ্ট লরেন্স নদীর মধ্যস্থিত সহস্র-দ্বীপোদ্যান (Thousand Islands Park) নামক বৃহত্তম দ্বীপে তিনি কিছুদিন তাঁহার এক শিষ্যের কুটিরে বাস করেন। এইস্থানে স্বামীজী নানাবিধ শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানের বিষয় অনেক গ্রন্থে বিশদভাবে বিবৃত আছে সেইজন্য সেই সকল বিষয় এস্থানে পুনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই। অপর গ্রন্থে যাহা উল্লেখ করা হয় নাই সেই সকলগুলি বলাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

স্বামীজীর আমেরিকায় অবস্থানকালে তৎদেশীয় প্রধান পণ্ডিত-মণ্ডলীর সহিত বেশ আলাপ পরিচয় হইয়াছিল এবং তাঁহারা স্বামীজীকে আপনার লোক বলিয়া মনে করিতেন। নিউইয়র্ক সহরে মিঃ লেগেট্ ও তাহার ভগ্নী মিস্ জোসেফাইন ম্যাকলাউড, সিষ্টার ক্রিশ্চিনা গ্রীন স্টাইডেল প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার মন্ত্র শিষ্য হইতে লাগিলেন। মিঃ লেগেট্ আমেরিকার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। গুড্‌উইন কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিল যে নিকোলাস্, টেস্‌লা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা স্বামীজীকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

স্বামীজীর My Mother সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বোষ্টনে ওলীবুলের গৃহে অবস্থানকালে স্বামীজী 'My mother' নামক একটি উদ্দীপনায় বক্তৃতা দেন। Divine mother হইতে human mother কি করে আসছে সেইটি তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া সভার বিদুষী শ্রোতৃবৃন্দ এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে পরবর্তী খৃষ্টমাসের সময় তাঁহারা স্বামীজীর অজ্ঞাতসারে মেরী-অঙ্ক সুশোভিত বালক খৃষ্টের একটি সুন্দর

চিত্রের সহিত একখানি পত্র দিয়া স্বামীজীর জননীর নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্রে স্বামীজীকে ভগবান যীশুখৃষ্টের সদৃশ এই ভাবটি প্রকাশিত হইয়াছিল।

যদিও সাধারণ ও পণ্ডিত লোক স্বামীজীকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে লাগিল কিন্তু খৃষ্ট যাজকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহারা স্বামীজীর বিপক্ষে অনেক প্রকার কুৎসা রটাইতে লাগিল। এক সময় স্বামীজী কোন নগরে বক্তৃতা করিতে যান। রাত্রিতে অবস্থানের জন্য তিনি কোন হোটেলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন কিন্তু হোটেলের লোকেরা তাঁহাকে থাকিতে দিল না। এইরূপে কয়েকটি প্রধান হোটেলে যাইলে সকলেই তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাঁহাকে একটি সামান্য হোটেলে সে রাত্র কাটাইতে হইয়াছিল।

স্বামীজী ও জনৈক ভদ্রলোক—লণ্ডন অবস্থানকালে স্বামীজী আমেরিকানদের সম্বন্ধে একটি গল্প বলিয়াছিলেন। একবার তিনি মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া রাস্তা দিয়া যাইতেছেন। পিছন হইতে একটি লোক আসিয়া তাঁহার পাগড়ির পেছনের ঝালরটি ধরিয়া টানিল। স্বামীজী ফিরিয়া যখন ইংরাজিতে তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন তখন লোকটি অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আপনি ইংরাজী জানেন! তবে আপনি ভদ্রলোক।" অর্থাৎ তৎদেশীয় ভাষা না জানিলে মানুষ ভদ্র হইতে পারে না ইহাই তাহার ধারণা ছিল।

লণ্ডন অবস্থানকালে স্বামীজী এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। একজন সুরাপায়ী অতিশয় মদ্যপান করিত। তাহার অভ্যাস ছিল যে নগরের প্রত্যেক সুরাপানাগারে গিয়া সে এক এক গ্লাস করিয়া হুইস্কি খাইয়া বেড়াইত। এইরূপে সে সমস্ত নগরটি ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত এবং সকল স্থানে সুরাপান করিত। স্বামীজী যদিও নিজের নাম উল্লেখ করেন নাই কিন্তু তিনি বলিয়াছিলেন যে, কোন ব্যক্তি সেই সুরাপায়ীকে এই ধারণা করাইয়া দিল যে শৌণ্ডিকেরা হুইস্কির সঙ্গে রেড়ীর তেল মিশাইয়া দিয়াছে। সুরাপায়ী পানাগারে গিয়া গ্লাসে শুঁকিয়া দেখে যে হুইস্কির সাথে রেড়ীর তেল মিশান রহিয়াছে। সে

সেই দেখিয়াই-তো রাগিয়া গিয়া গাল দিতে দিতে সে দোকান হইতে বাহির হইয়া অন্য দোকানে যায়। সে দোকানেও গিয়া দেখে যে সেখানেও হুইস্কির সঙ্গে রেড়ীর তেল মিশান রহিয়াছে। এইরূপে তাহার কোন দোকানে আর হুইস্কি খাওয়া হইল না। অবশেষে তাহার ধারণা জন্মিল যে হুইস্কির সহিত কারবারীরা এক পিপা রেড়ীর তেল মিশাইয়া দিয়াছে। এইরূপে তাহার দুই চারদিন আর হুইস্কি খাওয়া হইল না। ফলে হুইস্কিতে রেড়ীর তেল আছে এই ধারণায় সে সুরাপান অভ্যাস ত্যাগ করিল। স্বামীজী এই গল্পটি ব্যঙ্গ করিয়া মাতালের ন্যায় নকল করিয়া বলিতেন।

স্বামীজী ও জনৈকা মহিলা—স্বামীজী লণ্ডন অবস্থাকালে একদিন ষ্টার্ডিকে এই গল্পটি বলিতে লাগিলেন। আমেরিকায় এই সময় এক বৃদ্ধা আসিয়া স্বামীজীকে বলেন যে তাহার জননীর মস্তকের কেশ শুভ্র এবং বয়সও অধিক হইয়াছে, গালের মাংস সমস্ত কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সব সময়ই দেখেন যে তাহার সঙ্গে তাহার প্রতিরূপ রহিয়াছে। টেবিলে খাইতে বসিলে দেখেন যে তাহার সদৃশ আর একজন বৃদ্ধা বসিয়া রহিয়াছেন। হাত বাড়াইয়া কোন জিনিস লইতে চাইলে দেখেন যে আর একজনও হাত বাড়াইয়া জিনিস লইতেছেন। বিছানায় শয়ন করিবার সময় দেখেন যে আর একজন শুইয়া আছেন। এইরূপ প্রত্যেক জিনিসে তাহার সদৃশ আর একটি অবয়ব দেখিতে পান। বৃদ্ধাটি স্বামীজীকে তাহার জননীর বিষয় নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং সুবিধামত এক সময় তাহার জননীকে আনিয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। স্বামীজী শুভ্রকেশ বৃদ্ধার সহিত অনেক কথাবার্তা কহিয়া তাহার সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইলেন।

স্বামীজীর জনৈকা বৃদ্ধাকে শক্তি সঞ্চার করা—তাহার দ্বিত্ব-শরীরের বিষয় অনেক কথাবার্তা কহিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপভাবে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন সে কথাটা স্পষ্ট বোঝা যাইল না। গৃহে অবস্থিত সারদানন্দ স্বামী, ষ্ট্যার্ডি, গুড্‌উইন ও

বর্তমান লেখকের সে বিষয় প্রশ্ন করিবার সুবিধা হইল না। যাহা হউক বেশ বোঝা যাইল যে স্বামীজী তাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ফলে অতি বৃদ্ধা মহিলাটির সমস্ত শুভ্র কেশগুলি স্বাভাবিক কালো হইয়া যাইল, মুখের লোল কুঞ্চিত মাংস পুনরায় দৃঢ় হইয়া উঠিল এবং তাহাকে তরুণ বয়স্কা দেখাইতে লাগিল, তাহার কন্যার চাহিতে তাহাকে অল্পবয়স্কা দেখাইতে লাগিল। কিন্তু শক্তি সঞ্চার বা অন্য কোন বিষয়ের কথা স্বামীজী কিছু আর বলিলেন না।

স্বামীজীর জনৈক আইরিস চাষার গল্পবলা—স্বামীজী কৌতুকচ্ছলে এক আইরিস চাষার গল্প বলিয়াছিলেন। এক আইরিস চাষা— পূর্বে সে কখন গির্জায় যায় নাই বা যীশুর কোন উপাখ্যান শুনে নাই। বৃদ্ধ হইয়া তাহার মনে হইল যে গির্জায় যাইতে হইবে। অবশেষে এক রবিবারে সে এক গির্জায় যাইল। সে গির্জায় গিয়া পাদ্রীর মুখে শুনিল যে ইহুদীরা প্রভু যীশুকে মারিয়াছে, এই কথা শুনিয়া সে তো ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া গির্জার দ্বার হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া দেখে যে তাহার সম্মুখ দিয়া এক ইহুদি যাইতেছে। সে সেই ইহুদিকে দেখিয়াই ত তাহাকে কিলাইতে লাগিল আর ইহুদিটি অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া মার খাইতে লাগিল। অবশেষে ইহুদিটি সেই চাষাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমায় মারছ কেন?" আইরিসটি বলিল, "তোমরা আমার প্রভুকে মারিয়া ফেলিয়াছ সেইজন্য আমি তোমায় মারছি।" ইহুদিটি তখন বলিল, "সে ব্যাপার তো ১৯০০ বৎসর আগে হয়ে গেছে এখন তার কি?" আইরিসটি বলিল, "সে সব কথা আমি জানি না, আমি এই মাত্র পাদ্রীর মুখে প্রথম শুনিলাম তাই আমি ইহুদিদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিব।" স্বামীজী এই গল্পটি—"This is the first time I heard it,' অতি হাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন।

স্বামীজী এক সময় কৌতুক করিয়া নিউইয়র্ক সহরের চীনাদের ইংরাজী বলিতেন, "O me Melican Chinaman. Me eat polk me eat blandy. me eat evely thing।" চীনেরা 'র'

স্থানে 'ল' প্রয়োগ করে সেই জন্য brandy স্থানে blandy, pork এর স্থানে polk উচ্চারণ করিয়া থাকে।

স্বামীজীর আমেরিকার কথা বলা—স্বামীজী আর একদিন বলিতে লাগিলেন "আমেরিকাটি যেন বিদ্যুতে পরিপূর্ণ। উাহারা সব কাজ বিদ্যুৎ দিয়া করিতে চাহিতেছে। আমি টেসলা ও এডিসন প্রভৃতির সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম যে ওরা ধর্মকর্ম বা Philosophy অত বোঝে না, ওদের electric এর কথা বোললে ওরা বুঝতে পারে। ওরা জাতটিকে দেখছে electric এর ভিতর দিয়ে, আমি চাই আমার দেশের ছেলেরা আমেরিকায় গিয়ে electricity খুব শিখে; electricityটা বিদ্যুতের ব্যাপার। ভারতবর্ষের যুবকেরা চলুক গিয়ে ভাল করে শিখে এসে দেশের কাজে লাগাক। আমেরিকায় যে জিনিসটি দেখছি, যেখানে যাচ্ছি সব যেন একেবারে বিদ্যুতে ভরা আর সেই জন্য জাতটা এত টপ্ টপ্ করে বেড়ে যাচ্ছে।

আমেরিকার স্বাধীনতার কথা—আর একটি জিনিস আমেরিকায় দেখলুম। কি কর্মের ইচ্ছা! কেউ কাহারও উপর নির্ভর করে না। ছেলে বাপের উপর, বাপ ছেলের উপর নির্ভর করে থাকতে চায় না। যে যার স্বতন্ত্র হয়ে অর্থ রোজগার করতে চায় এবং নিজেও স্বাধীন হয়ে থাকতে চায়। তেজী ভাবটা আছে বলে লোকগুলো বেশ হৃষ্টপুষ্ট, ভাল খায়-দায় ও দীর্ঘজীবী হয়। স্বাধীনতা যে কি জিনিস, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যে কি জিনিস সে আমেরিকায় গেলে বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। ইংলণ্ড হচ্ছে পুরাণ ধাঁজের দেশ, এখানে সেটা ঠিক বুঝা যায় না। আমেরিকায় দেখলুম, কি ছোট কি বড় সকলেই কাজ করতে মহা উৎসাহী এবং সকলেই আশা করে থাকে যে সে ভবিষ্যতে ক্রোড়পতি হবে এবং এমন কি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হবে। আমি নিউইয়র্কে দেখতুম সিরিয়া, ইটালি এবং অন্যান্য দেশ থেকে গরীব লোক কাপড়ের পুঁটলি মাথায় নিয়ে আমেরিকায় আসচে। গরীব লোক, ভয়ে ভয়ে রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলে, কোন হোটেলে ঢুকতে সাহস করে না এবং যেন অস্পৃশ্য

অপরাধীর ন্যায় বাস করে। কিন্তু মাস দুই তিন বাদে সেই লোকটা নূতন পরিচ্ছদ পরে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়েছে। দু'ডলার রোজগার করছে এবং সকলের সঙ্গে সমানভাবে কথাবার্তা বলছে। আমেরিকায় সংবাদপত্রে কয়েকবার পড়া গেছে যে বাপ ক্রোড়পতি, মরবার পর উইলে দেখা গেল যে নিজের বৃদ্ধা স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য সামান্য কিছু অর্থ রাখিয়াছে এবং অবশিষ্ট সমস্ত অর্থ কোন সৎকার্যে দান করিয়া গিয়াছে। ছেলেদের জন্য এক পয়সাও রাখিয়া গেল না। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে ছেলেরা বাপের কোন অর্থ লইল না। কর্ম—কর্ম—আত্মবিকাশ—প্রতিবন্ধক চূর্ণ বিচূর্ণ করা—স্বাধীনতা প্রকাশ করা—এই যেন আমেরিকার হাওয়াতে বহিতেছে।"

স্বামীজী এই সকল কথা বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমাদের দেশের ছেলেদের ভিতর এই জিনিস যেমন করেই হউক ঢুকাইতে হইবে।" আমেরিকায় বক্তৃতাকালে স্বামীজী একবার বলিয়াছিলেন যে কোন ব্যক্তি এইরূপ জড়ভাবাপন্ন ছিল যে তাহার উচ্চভাব বা জগতে উন্নত হইবার আর কোন আশা ছিল না। স্বামীজী এই জন্য তাহাকে দুষ্টুমি করিতে ও মিথ্যাকথা কহিতে বলিয়াছিলেন অর্থাৎ যাহাতে তাহার জড়ত্ব নাশ হয় ও উচ্চ ভাব আসে।

নগেন্দ্রনাথ বসু—বরাহনগরের মঠ যখন প্রথম বৎসর হইয়াছে তখন স্বামীজী একদিন রামতনু বসুর গলির স্বীয় বাড়িতে আসিলেন। পার্শ্ববর্তী বাটির নগেন্দ্রনাথ বসু নামক একটি যুবক আসিয়া স্বামীজীকে বলিল, "নরেনদা, আমায় সন্ন্যাসী করে নাও, আমি গেলুম, আমার কিছু হবে না। আমি কি কোরব জানি না তুমি আমায় সন্ন্যাসী করে নিয়ে কাছে রাখ।" যুবকটি সম্পর্কে স্বামীজীর মামাত ভাই হইত। সেই কথা শুনিয়া স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি কোন কাজ করিস না? নগেন বলিল যে সে চুপ করে বসে থাকে। সর্ব্বদাই ভয় পায় এবং বিষণ্ণ মনে থাকে। স্বামীজী খানিকক্ষণ তার

দিকে চাহিয়া মনে মনে কি ভাবিয়া বলিলেন, "তুই দুষ্টামি করগে যা, মিথ্যা কথা বলগে যা তাহলে তোর ভেতরে চনচনে ভাব আসবে তখন তোর জড়ত্বভাব কেটে যাবে।" কিন্তু মাস কতক পরে নগেন পাগল হয়ে গেল। কাহারও সহিত কথা কহিত না, কোঁচার কাপড়টি গায়ে দিয়া রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়াত, মানুষ চিনতে পারত না। দুই বৎসর এই ভাবে থাকিয়া সে দেহত্যাগ করে। নগেনের উপাখ্যানটি স্বামীজী কয়েকবার বক্তৃতাতে বলিয়াছিলেন।

জনৈক গুজরাটী যুবককে স্বামীজীর অর্থ সাহায্য করা—একদিন স্বামীজী কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, তিনি যখন নিউইয়র্ক বা অন্য কোন সহরে ছিলেন তখন একটি গুজরাটী যুবক দেখা করিতে আসিয়া পাঁচ কথার পর বলিল যে, সে আমেরিকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহার দেশ হইতে দুই এক মাস কোন টাকা আসে নাই সেইজন্য সে একটু বিপদে পড়িয়াছে। স্বামীজী শুনিবামাত্র অতি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন এবং ক্ষণবিলম্ব না করিয়া বলিলেন, "দেখ আমার কাছে বিশেষ কিছু নাই, এই পকেটে দেখছি ৪০টা ডলার আছে", বলিয়া পকেটে হাত দিয়া টাকাগুলি বাহির করিয়া বলিলেন, "তুমি এই টাকা নিয়ে যাও এবং আর যদি কিছু জোটে পরে এস দেব।" যুবকটি অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হইয়া সেই টাকা গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু পরে তাহার বিষয় আর কিছু জানা যায় নাই। এইটি তিনি দেশাই নামক যুবককে বলিয়াছিলেন।

লণ্ডনে অবস্থানকালে স্বামীজী একদিন হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে বীরচাঁদ গাঁধি নামক এক ব্যক্তি চিকাগো পার্লিয়ামেণ্টে জৈন ধর্ম বিষয়ে বলিতে গিয়াছিলেন। লোকটি অতিমাত্রায় নিরামিষ ভোজী। হোটেলে গিয়াই ত তিনি প্রথম বন্দোবস্ত করেন যে তিনি নিরামিষ ভোজী কোনরূপ মাছ মাংস খাইবেন না। হোটেলে তদ্রূপই হইতে লাগিল। একদিন তিনি কফি খাইতেছেন এমন সময় তাঁহার কফির সহিত ডিমের খোলা বাহির হইয়া পড়িল। লোকটি

ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল, "একি করেছ?" ভৃত্যটি বলিল, "ডিমটা মাংসের ভিতর গণ্য নয় ওটা নিরামিষের মধ্যে।" একজন বলিল, "There is egg shell in the coffee pot." আর একজন বলিল, "ডিম নিরামিষের মধ্যে।" স্বামীজী এই বলিয়া মুখভঙ্গি করিয়া হাস্য রহস্য করিতে লাগিলেন। পরে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "অত গোঁড়ামী করে কি বিদেশে থাকা চলে রে বাপু? সব জিনিসটাকে নিজের মত করে নিতে হয়।"

স্বামীজী ও চিত্রকর দম্পতি—আমেরিকায় এক দম্পতী ছিল উভয়ে চিত্রকর, দেখিতে বেঁটে বেঁটে গোল গাল শরীর। দুটীতে বন্ধুভাবে দুইজনেই ছবি আঁকিয়া বেড়াইত। তাহারা স্বামীজীকে বড় ভক্তি করিত ও মাঝে মাঝে বাইক্ করিয়া আসিয়া তাহাদের যন্ত্রপাতি লইয়া উভয়ে স্বামীজীর দুই ধারে বসিত। স্বামীজী মাঝখানে বসিয়া রহিলেন, আর তাহারা দুইজনে স্বামীজীর ছবি আঁকিতে সুরু করিল। দুইজনের জিদ্ হইল, কে কাহার অপেক্ষা ছবি হুবহু তুলিতে পারে এবং সেইরূপ ব্যগ্রভাবে দুইজনে ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিত। স্বামীজী মাঝখানে আড়ষ্ট বন্ধনে বসিয়া রহিলেন আর তাহারা দুইজনে ছবি তুলিতে লাগিল। তাহাদের ছবি তোলা অপেক্ষা পরস্পরের যে প্রাধান্যের ইচ্ছা সেইটাই বড় আনন্দ লাগিত। এই গল্পটি বলিতে বলিতে স্বামীজী খুব হাসিতেন।

স্বামীজীর আমেরিকা যাইবার কারণ—আর একদিন স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, "আমেরিকাতে দেখলুম যে ৮০/৯০ বৎসরের অনেক লোক। ৬০ বৎসরকে প্রৌঢ়ের ভিতর ধরে। আমেরিকার লোকগুলি বহুকাল বাঁচে, ইংলণ্ডের লোকগুলিকেও দেখি বহুকাল বাঁচে কিন্তু ভারতবর্ষের লোকগুলি শীঘ্র শীঘ্র মরে যায়। তারা যে wretched খায় (দুখচেটে খায়) তাইতে এত শীঘ্র মরে যায়। ভারতবর্ষীয়দের খাওয়াটি বদলে দেওয়া দরকার। আমেরিকাতে যখন ছিলুম তখন কয় বৎসরের ভিতর কোন ব্যামো-স্যামো হয় নাই, সামান্য কয়েকদিন একটু সর্দি কাশি হয়েছিল। ঐ ভূতের মত

পরিশ্রম করেছি তাতে কিন্তু শরীর খারাপ হয় নি। ওদেশের জল বায়ু খুব ভাল আর লোকগুলি কতকালই না বাঁচে—মরতে আর চায় না। কি সাহস! কি উদ্যম! লোকগুলি যেন চন্‌মন্‌ করে বেড়াচ্ছে। আর ভারতবর্ষের লোকগুলি নিঝুম—যেন বসে বসে ঢুলছে। এই যে বেদান্তের কথা আমি হেঁটে হেঁটে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে গাঁয়ে গাঁয়ে লোকদের বলে বেড়িয়েছিলুম—যদি তারা আমার কথা লয়। কিন্তু লওয়া ত' পরের কথা উল্টে বিদ্রূপ করতে লাগল, নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা করতে লাগল। আমার প্রাণটায় বড় লাগলো। মনে করলাম একটি স্বাধীন দেশে গিয়ে এইটা বলব। স্বাধীন জাত না হলে এভাব নিতে পারবে না, তাই দেখলুম চিকাগোতে একটি সভা হবে, সেই না দেখে আমি চোঁ চাঁ দৌড় মেরে চিকাগোতে হাজির হলুম। তারাই ত প্রথমে বেদান্তের ভাবটা appreciate করলে। কিন্তু ভারতবর্ষ নিঝুম, তারা এ ভাব নিলে না।" স্বামীজী এইরূপ আক্ষেপ করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন।

স্বামীজী একবার এক বক্তৃতায় ভগবান যীশুকে খুব প্রশংসা করিয়াছিলেন কিন্তু পাদ্রী ধর্ম-যাজকদিগকে তিনি একটুকু তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছিলেন। সংবাদ পত্রে এই কথাগুলি উঠিয়াছিল যে, "যদিও বাক্যগুলি অতি তীব্র, ডাক্তারের ছুরীর ধারের মত মাংস কাটিয়া দেয় কিন্তু পরে রোগ আরোগ্য করিয়া থাকে।"

পূর্বে আলমবাজার মঠের কথা বন্ধ করিয়া সকলের পর্যটনের কথা বলা হইয়াছিল এবং স্বামীজীর পর্যটন প্রসঙ্গে তাঁহার আমেরিকা গমন এবং তথাকার প্রচার কার্যের সামান্য মাত্র বলা হইয়াছে, কারণ, সেই সকল বিষয় বহু পুস্তকে লিখিত আছে। কিন্তু সেই সময় আলমবাজার মঠে কি কি কার্য হইয়াছিল তাহা বলা আবশ্যক বিবেচনা করায় পুনরায় আলমবাজার মঠের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হইল।

স্বামী সদানন্দ—বরাহনগর মঠে গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতে লাগিলেন। শরৎ মহারাজ তাঁহাকে

পরামর্শ দিলেন, "কিছু দিন দেশে (জৌনপুরে) গিয়া বাস কর, তাহলে শরীরটা ভাল হইয়া যাইবে। বাংলা দেশের জল বাতাস তোমার পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।" সেইকথা শুনিয়া গুপ্ত মহারাজ অল্পদিনের জন্য দেশে ফিরিয়া যান। তখন তাঁহার পিতা মাতা জীবিত ছিলেন এবং তাঁহারা সংসারের নানা দুঃখ প্রকাশ করিয়া গুপ্ত মহারাজকে বলিলেন যে তাঁহাদের কিছু ঋণ হইয়াছে এবং পিতার ঋণ পুত্রের পরিশোধ করিয়া দেওয়া কর্তব্য, এইটি বারংবার বলিতে লাগিলেন। গুপ্ত মহারাজ বীর পুরুষ, কোন কার্যে তিনি ভয় পাইতেন না। তিনি পিতাকে বলিলেন, "আচ্ছা, চাকরি করিয়া দেনা শোধ করিয়া দিব, তাতে আর ভয় কি।" সেই কথা শুনিয়া পিতা মাতা মনে করিলেন যে একবার চাকরিতে ছেলে ঢুকিলে আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিবে।

তালিদার বাবা—গুপ্ত মহারাজের পিতা মাতার সংসারে এই সময় আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। গুপ্ত মহারাজ সেই ঘটনাটি মাঝে মাঝে উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন যে তাহার সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধরচন্দ্র গুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন ও সন্তান-সন্ততি হইয়াছিল। তিনি বেশ ভাল চাকরি করিতেন। একদিন হঠাৎ তাঁহার বৈরাগ্য হওয়ায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান এবং সিন্ধু প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদে অনেক কাল ছিলেন। সকলে তাঁহাকে 'তালিদার বাবা' বলিত কারণ তিনি দুই হাতে মৃদুভাবে তালি দিয়া ওঁ শব্দটি উচ্চারণ করিতেন। হায়দ্রাবাদে তাঁহাকে সকলে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া সম্মান ও শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। তালিদার বাবা একবার কাশীধামে দুর্গা বাড়িতে ছিলেন এবং সিন্ধুদেশ বাসীরা তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিত।

কয়েক বৎসর বাদে তালিদারবাবা একবার নিজদেশ জৌনপুরে আসিয়া এক অশ্বত্থগাছের তলায় বসিয়া রহিলেন। দুগ্ধ ও কলা আহার করিতেন, অন্য কিছু আহার করিতেন না। গুপ্ত মহারাজের পিতা যদুনাথ গুপ্তের বন্ধুরা শুনিলেন যে অধর গুপ্ত ফিরিয়া

আসিয়াছে এবং খুব উচ্চ অবস্থার সাধু হইয়াছে। কিন্তু সাধু দর্শন করিতে যাইতে হইলে সাধুকে প্রণাম করিতে হয়। এই বিষয়েই তাঁহাদের বিষম সঙ্কট আসিল ও তাঁহারা বলিলেন, "যত্নুর বেটাকে কি করে প্রণাম করব?" এইজন্য বৃদ্ধেরা কিছুদিন দেখা করিতে যাইলেন না কিন্তু কয়েকজন বৃদ্ধ ব্যতীত অপর সকলে উচ্চ অবস্থার সাধু দর্শন করিতে গিয়াছিল। ইহাকে বলে সংসারের ভ্রম। গুপ্ত মহারাজ এই কথা লইয়া হাস্য কৌতুক করিতেন। বর্তমান লেখক সিন্ধুদেশবাসীদিগের নিকট তালিদার বাবার অনেক অলৌকিক উপাখ্যান শুনিয়াছেন।

তালিদার বাবা ও সিষ্টার নিবেদিতা—তালিদার বাবা একটি গাছের তলায় ১৪ বৎসর বসিয়া ছিলেন। সেই স্থানে বসিয়াই জপ করিতেন ও মৃদু স্বরে ওঁ শব্দটি উচ্চারণ করিতেন। দুগ্ধ ও কলা দিলে খাইতেন নচেৎ কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না। একবার সিন্ধুনদীতে খুব বান আসে এবং নিকটস্থ সমস্ত স্থান ডুবিয়া যায়। জল খরস্রোতে চলিতে লাগিল। অবশেষে হায়দ্রাবাদের বৃদ্ধদের আতঙ্ক হইল যে তালিদার বাবা গাছের তলায় বসিয়া আছেন, তিনি হয়তো জলে ভাসিয়া গিয়াছেন। জনকতক লোক রাত্রিতে লণ্ঠন হাতে লইয়া জল ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে গাছের তলায় গিয়া দেখিল যে তালিদার বাবা বসিয়া জপ করিতেছেন। সকলে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইল যে তালিদার বাবার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। ৺কাশীধামে সিষ্টার নিবেদিতার সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গুপ্ত মহারাজ বলিলেন, "সিষ্টার নিবেদিতা তালিদার বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এরূপ উন্নত অবস্থা কি করিয়া হইল? তিনি প্রত্যুত্তরে বলিলেন, কি-ই-বা এমন হয়েছে, শুধু বসে জপ করি এই মাত্র, আর কিছুই বুঝি না।"

গুপ্ত মহারাজ সিমলায় বার্ড এণ্ড কোম্পানীর নিকট চাকরি করিয়া পিতার ঋণ শোধ করিয়া দিয়া পুনরায় আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়া গৈরিক বসন পরিধান করিলেন এবং সাধুর ভাবে

রহিলেন। তাঁহার কিছুই বদল হয় নাই, যে পুরাতন গুপ্ত মহারাজ সেই গুপ্ত মহারাজই রহিলেন।

আলমবাজার মঠ ও জনৈক ভদ্রলোক—একদিন আলমবাজার মঠে বেলা আড়াইটা কি তিনটার সময় এক ভদ্রলোক অসিয়া উপস্থিত হইলেন। গায়ে আল্‌পাকার জামা, বুকে ঘড়ি, ঘড়ির চেন ও হাতে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ। শিবানন্দ স্বামী, গুপ্ত মহারাজ ও আরও জন কয়েক কালীবেদান্তীর ঘরের সম্মুখের বারান্দাতে অর্থাৎ বাড়ির ভিতর পশ্চিমদিককার বারান্দাতে বসিয়া ছিলেন। ভদ্রলোকটি আসিয়া শিবানন্দ স্বামীকে প্রণাম করিয়া অল্প কথাবার্তা কহিলেন এবং তৎসঙ্গে গুপ্ত মহারাজের নাম শুনিয়া লইলেন। অনতিবিলম্বে ভদ্রলোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "গুপ্ত, আমার জামাটা ধর আমার সমাধি আসছে।" এই বলিয়া তাড়াতাড়ি জমাটি খুলিয়া গুপ্ত মহারাজকে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি ও চেন খুলিয়া দিলেন এবং হাতের ব্যাগটা ঠিকঠাক করিয়া রাখিয়া সমাধিগ্রস্থ হইলেন। গুপ্তমহারাজও কৌতূক করিয়া হৃদু মুখুজ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধির সময় যেরূপ পশ্চাতে দাঁড়াইত তদ্রূপ করিয়া তাহার পশ্চাৎভাগে দাঁড়াইলেন। ভদ্রলোকটি আধা সমাধি-গ্রস্থ হইয়া 'রুর্ রুর্' করিয়া মুখে আওয়াজ করিতে লাগিলেন। সেই ব্যাপার দেখিয়া সকলেই কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাহার সমাধি ভঙ্গ হইলে তাড়াতাড়ি বলিলেন, "গুপ্ত আমার চশমাটা দাও, আমার ঘড়ি, ঘড়ির চেন ও ব্যাগটা দাও", এবং চশমা ও চেনটি যথা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া ব্যাগটি খুলিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সমস্ত জিনিস যথা স্থানে আছে কি না। তাহার পর বড্ড একটা কাজ আছে, আলমবাজারের ঘাটে খেয়া পার হইয়া বালীর ষ্টেশনে যাইতে হইবে বলিয়া তিনি চলিয়া যাইলেন। লোকটি চলিয়া যাইলে সকলেই হাস্য কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, "গুপ্ত আমার চশমাটা ধর, আমার ব্যাগটা ধর আমার সমাধি আসছে।" কিছুদিন সকলের ভিতর এইরূপ হাস্য কৌতুক

চলিয়াছিল। সেই লোকটির বিষয় বিশেষ কিছু জানা নাই তবে পরে আর দুই একবার মঠে আসিয়াছিল।

দীন মহারাজ—বৃদ্ধ দীন মহারাজ পদব্রজে গঙ্গা পরিক্রমা করিয়া আলমবাজার মঠে আসিয়া রহিলেন। তিনি ব্রত লইয়াছিলেন যে গঙ্গার কিনারায় তিন মাইলের বাহিরে আর যাইবেন না, ইহার ভিতর যদি গ্রাম পাওয়া যায় তা'হলে সেই গ্রামে গিয়া পাঁচ বাড়িতে ভিক্ষা চাহিবেন যদি কিছু না পান তবে সে দিন আর কিছু খাইবেন না। এইরূপ কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া হয়ত গঙ্গার কিনারায় তিন মাইলের মধ্যে অনেক সময় গ্রাম পাওয়া যাইত না। অগত্যা তাঁহাকে অনেক দিন উপবাস করিতে হইত। একবার তিনি দস্যুর হস্তে পড়িয়া ছিলেন। প্রথম তাহারা তাঁহাকে তর্জন গর্জন করিতে লাগিল ও বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। তাহাদের ব্যাপার দেখিয়া তিনি নিজের কৌপীন পর্যন্ত ফেলিয়া দিয়া রাত্রি-কালে এক শিব মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহাদের ভিতর হইতে একজন মুখে কাপড় জড়াইয়া দীন মহারাজের সম্মুখে খাবার ও জল রাখিয়া পলাইয়া যায়। এইরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। তিনি অতিশয় কঠোর ত্যাগী ও উন্নত অবস্থার সাধু। সেই সময় আলমবাজার মঠে বাহিরের ঘরে পূর্বেকার একখানি ছেঁড়া সতরঞ্চ ছিল—কতকগুলি সূতা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। সম্ভবতঃ মিরাট হইতে দীন মহারাজ তাঁহার এক আলাপী লোকের নিকট হইতে একখানি নূতন সতরঞ্চ আনাইলেন। এই হইল প্রথম আস্‌বাব এবং সকলেই নূতন সতরঞ্চ পাইয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন।

স্বামী অভেদানন্দ—কিছুদিন পর কালীবেদান্তী ও তুলসী মহারাজ আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন। কালীবেদান্তী মান্দ্রাজ হইতে জাহাজে করিয়া এবং তুলসী মহারাজ উত্তর পশ্চিম হইতে আসিলেন। ক্রমে ক্রমে মঠ লোকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। এই সময় একটি ছোট চৌকি ও রিডিং ল্যাম্প হইয়াছিল। চৌকিখানির

উপর বই রাখিয়া পড়িবার এবং রিডিং ল্যাম্প পাইয়া কালী-বেদান্তীর রাত্রে নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করিবার বেশ সুবিধা হইল। এক্ষণে জিনিস দুইটি অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে কিন্তু তখনকার দিনে উহাই মহা মূল্যবান জিনিস ছিল। এইরূপ জিনিস হইল দেখিয়া সকলের কি আনন্দ!

রাখাল মহারাজ ও হরি মহারাজ কিছুদিন পরে ফিরিয়া আসেন। সম্ভবতঃ হরি মহারাজ বোম্বাইয়ে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি কয়েকবার বলিয়াছিলেন, "আমি স্বামীজীকে দেখিলাম স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সে পুরাণ লোক আর নয়, নূতন ভাব-ভঙ্গি।" হরি মহারাজকে স্বামীজী বলিয়াছিলেন "হরি ভাই, ধর্ম কর্ম কিছু বুঝলুম না, তবে প্রাণটা বড় বেড়ে গেছে, বুকটার ভিতর ভালবাসা এসে গেছে।" ফিরিয়া আসিয়া হরি মহারাজ সাধন ভজন লইয়া রহিলেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রাখাল মহারাজও প্রায় এই সময় ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পূর্বেকার বিষণ্ণভাব তখন চলিয়া গিয়া গম্ভীরভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি সর্বদাই জপ করিতেন। কখন বসিয়া আছেন কখন বা পায়চারি করিতেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনবরত জপ করিতেছেন। মাঝে মাঝে আবশ্যক হইলে তীক্ষ্ণ হাস্য কৌতুকও করিতেছেন। শেষ জীবনে যে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল এবং সর্ব বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধির প্রাচুর্য দেখা গিয়াছিল এই সময় হইতেই তাহার আভাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। বাল্যকালের বা বরাহনগর মঠে অবস্থানকালের ভাব তিরোহিত হইয়াছে এবং ধীর গম্ভীর ভাবটি প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতেন না। বর্তমান লেখকের সহিত অনেক বিষয় কথাবার্তা হইত। সকলে না জানিতে পারে বা শুনিতে পায় সেইজন্য তিনি অল্পকথায় বা ইসারা করিয়া কি কার্য করা উচিত বা অনুচিত বলিয়া দিতেন। অল্প কথায় কার্য প্রণালী নির্ধারণ করিয়া দিবার তাঁহার একটি অসাধারণ শক্তি ছিল। একটি লক্ষণ তাঁহার ভিতর দেখিতে

পাওয়া যাইত যে তিনি সকলেরই নিকট ঋজু ও বিনয়ী হইয়া থাকিতেন এবং পারতপক্ষে এমন কোন কথা কখন বলিতেন না যে তাহাতে কাহার মনঃক্ষুণ্ণ হইতে পারে। এইজন্যই তাঁহার সহিত কাহার বাক্‌বিতণ্ডা হয় নাই। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে অথবা বাল্য অবস্থায় যখন তিনি অধ্যয়ন করিতে আসিয়া সিমলায় বাস করিয়াছিলেন তখন হইতে শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই ভাবটি বিশেষ পরিলক্ষিত হইত যে, অপরের ভাবের প্রতি বিশেষ আস্থা রাখিয়া তিনি কথা কহিতেন। এইজন্য কেহ কখন তাঁহার নিন্দা করে নাই। যদি 'অজাতশত্রু' এই শব্দটি বর্তমানকালে কাহাকেও বলা যাইতে পারে তাহা হইলে রাখাল মহারাজকেই দেখিয়াছি যে তিনি যথার্থই অজাতশত্রু।

স্বামী যোগানন্দ—এই সময় যোগেন মহারাজের অজীর্ণ পীড়া দেখা দিল। এই পীড়ায় তিনি অতিশয় কষ্ট পাইতেন কিন্তু কখনও তাঁহার মুখ ম্লান বা স্বভাব রুক্ষ হয় নাই। যেমন স্বাভাবিক প্রফুল্ল ভাব, যেমন পূর্বে হাস্যকৌতুক প্রিয় ছিলেন তিনি তদ্রূপই রহিলেন। এইরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন এবং দয়ার্দ্র লোক জগতে খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অবস্থায় পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে তিনি দার্জিলিঙে কয়েক সপ্তাহ থাকেন কিন্তু পীড়ার কোন উপকার না হওয়ায় তাহার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ডাক্তারি চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন উপকার না হওয়ায় তিনি সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসায় কিছুদিন থাকেন। যদিও পীড়া মাঝে মাঝে স্থগিত থাকিত কিন্তু আরোগ্য হইল না। এই পীড়ায় কয়েক বৎসর পরে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তিনি পূর্বে যেমন ধ্যানী জপ-পরায়ণ ছিলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত সেইরূপ জপপরায়ণ ছিলেন। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও নিজে অর্থ দিয়া পরের উপকার করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। অপ্রকাশিত ভাবে অনেক বিপদগ্রস্থ পরিবারকে তিনি সাহায্য করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি এরূপ প্রখর ছিল যে স্বামীজী ও গিরিশবাবু তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন।

স্বামীজী যোগেন মহারাজের পরামর্শ না লইয়া কোন বিশেষ কার্যে হাত দিতেন না এবং গিরিশবাবু তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিনিধি বোধে তাঁহার কথা কখন অগ্রাহ্য করিতেন না।

আলমবাজার মঠের অবস্থা—বরাহনগর মঠে বিশেষতঃ প্রথম অবস্থায় যেরূপ অনটন হইয়াছিল, অনেক সময় যেমন মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া সাধক সন্ন্যাসীরা দিনপাত করিয়াছিলেন, আলমবাজার মঠে ততটা না হউক অনেকটা সেই পরিমাণে ছিল কিন্তু এক বৎসর পর অজস্র জিনিসপত্র আসিতে লাগিল। সকলেই তখন তীর্থ পর্যটন করিয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন, সকলেরই তখন পূর্বেকার দ্বিধা ও বিষণ্ণভাব চলিয়া গিয়াছে, সকলেই যেন প্রফুল্ল, গম্ভীর ও উন্নত। তাঁহাদিগের সাধনা বা পুণ্যবলে আলমবাজারের মঠে বহু প্রকারের দ্রব্যাদি আসিতে লাগিল—মা লক্ষ্মী যেন হঠাৎ তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। শশীমহারাজ ও তাঁহার সহকারী তুলসী মহারাজ সেইরূপ উদার স্বভাবের লোক ছিলেন। কোন উৎসব উপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দকে পরিতোষ করিয়া আহার করাইতেন এবং উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি ভক্তদিগকে আপন আপন বাড়িতে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিতেন। যাঁহারা ইচ্ছা করিতেন ও সমর্থ হইতেন তাঁহারা সকলেই লইয়া যাইতেন কারণ শশীমহারাজ পরের দিনের জন্য দ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন না। হঠাৎ এই পরিবর্তনে সকলেই বিশেষ হর্ষিত হইয়া উঠিলেন। কোথায় একখানি কাপড় পাতিয়া তাহাতে ভিক্ষার পাঁচ মিশেলি চাল সিদ্ধ করিয়া ঢালিয়া নুন-লঙ্কার ঝোল দিয়া ভাত খাওয়া, আর কোথায় বা কলিকাতা সহরের উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি আলমবাজার মঠে ঢুকিতে লাগিল! ভক্তদিগের ভিতর এরূপ একটা ভালবাসা ও টান ছিল যে যদি কেহ মঠ দর্শন করিতে আসিতেন তাহা হইলে ঠাকুরের জন্য বিশেষ উৎকৃষ্ট সামগ্রী হাতে করিয়া লইয়া আসিতেন। প্রত্যেক জিনিসটা যেন ভালবাসা মাখান বা ভালবাসা পুঞ্জীকৃত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ—একদিন গিরিশবাবু

বলিতে লাগিলেন যে তিনি এক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যান। এ কথা ও কথার পর সাধুদের আচরণের কথা উঠিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মানব-চরিত্র পর্যবেক্ষণে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ সকল প্রকার লোকের চরিত্র হাব-ভাব ভঙ্গিমা বা কথাবার্তা তিনি হুবহু নকল করিয়া দেখাইতেন; এবং প্রত্যেক লোকের পোষাক পরিচ্ছদে কিরূপ মনের ভাব পরিবর্তন হয় তাহাও তিনি বিশেষ করিয়া বলিতে পারিতেন। অর্থাৎ নরচরিত্রের কোন বিষয় তাঁহার নিকট অজ্ঞাত ছিল না, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বুঝিতেন ও দেখাইতেন।

এই প্রসঙ্গে এক প্রকারের ব্যবসায়ী সাধুদের কথা উঠিল, যাহারা বেশভূষা বা বাহ্যিক আচারে পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতে লাগিলেন, "এ সব লোকের চিহ্ন কি জান? লম্বা জামা পরে, জামার আস্তানাটা কনুই পর্যন্ত থাকে। গলায় বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা—সেগুলো আবার সোনার বা রূপার তারে গাঁথা মাঝে মাঝে একটি প্রবাল বা অন্য দামী জিনিস দেয়। কথাবার্তায় তারা সব-জান্তা আর এইরূপ করিয়া তারা হাত নাড়ে"—এই বলিয়া তিনি ডান হাতের তর্জনী কিছু উঁচু করিয়া এবং অবশিষ্ট তিনটি আঙ্গুল নীচু করিয়া হাতের পাতটা দুলাইয়া তাদের ভাব-ভঙ্গি দেখাইতে লাগিলেন। গলা কি করিয়া সঞ্চালন করিতে হয়, কণ্ঠস্বর কিরূপ পরিবর্তন করিতে হয়, চক্ষু ও মুখভঙ্গি কিরূপে নানাপ্রকার করিতে হয়, তাহাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সেইদিন হুবহু দেখাইতে লাগিলেন। গিরিশবাবু বলিলেন যে তিনি নিজে অভিনেতা, অভিনয় করাই তাঁহার ব্যবসা, কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবসায়ী সাধুর অভিনয় করা এত সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে তিনি হুবহু সেইটা লিখিয়া লইলেন এবং অভিনয়কালে ঠিক তদ্রূপই দেখাইতেন। অনেক সময় তিনি কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রদর্শিত ভাব-ভঙ্গি ও হস্ত সঞ্চালন করিয়া সকলকে দেখাইতেন। গিরিশবাবু বলিতেন যে তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) সর্ব বিষয়ে উৎকর্ষ ছিল। বিল্বমঙ্গলে

সাধকের পালা যে এত উত্তম হইয়াছিল, কারণ তাহাতে শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব প্রদর্শিত পথ ছিল, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ্রীরাকৃষ্ণদেবের মহাবীরের ভাব—গিরিশবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সম্বন্ধে আর একটি গল্প বলিতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবেব একবার মহাবীরের ভাব হইল, নিকটস্থ কোন গাছে উঠিয়া তিনি প্রস্রাব করিতে লাগিলেন এবং কাপড়ের তৈয়ারি লাঙ্গুলও নাকি করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় ও উপস্থিত সকল ব্যক্তি তাঁহার এইরূপ ভাব দেখিয়া তাঁহাকে উন্মাদ বলিয়া স্থিব কবিলেন এবং বিদ্রূপ ও ভৎ´সনা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের তাহাতে মনের চঞ্চলতা আসে নাই। যে ভাব যেরূপ ভাবে তাঁহার মনে উদয় হইত দেহেব প্রত্যেক স্নায়ু সেইভাব অনুযায়ী পবিবর্তীত হইত ও কার্য করিত। সাধারণ লোকে পরিদৃশ্যমান জগৎ এক প্রকার দেখে ও ভাব-জগৎ অন্য প্রকার দেখে, দুই কখন এক করিয়া মিলাইতে পারে না। উভয়বিধ জগতের মাঝে একটি ব্যবধান আছে, সেইস্থানে মন গমন করিলে স্তম্ভিত হইয়া যায়। সেই স্তম্ভন ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে সাধারণের মনের গতি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মনের গতি উচ্চ অবস্থালাভ কবায অন্য প্রকার ছিল, তাঁহার পরিদৃশ্যমান (Phenomenon) জগৎটা ভাবানুগত (Noumenon) হইয়া যাইত এবং Noumenon বা ভাব জগৎটা Phenomenon বা পরিদৃশ্যমান জগৎ হইয়া যাইত এবং ব্যবধান বা Point of Polarization একেবারে বিদূরিত হইয়াছিল। এইজন্য তিনি সবই এক দেখিতেন। সূক্ষ্ম স্থূল সবই এক। যে কোন ভাব তাঁহার মনে উদয় হইলে সেটা তাঁহার দেহেতে প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্বিত হইত।

যাহা ইউক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গাছে উঠিয়া প্রস্রাব করায় সকলে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন। গিরিশবাবু তাই বলিতেন, "ঠাকুর, গাছে উঠিয়া আর প্রস্রাব করিও না", অর্থাৎ আত্মগোপন করিয়া আমাকে আর ভুলাইও না। নিজেকে দুর্বল মনে করিয়া তিনি এই কথাটি

বলিতেন। গিরিশবাবু এই কথাটি অতি ভক্তি ও বিনয় সহকারে বলিতেন এবং দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় তুলিয়া প্রণাম করিতেন।

গিরিশবাবুর যোগেনমহারাজের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল। তাঁহার ধারণা ছিল যে যোগেন মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিনিধিস্বরূপ, তাঁহাকে পর্যবেক্ষণ করিযা বুঝিয়াছিলেন যে যোগেন মহারাজের আদেশ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশ প্রায়ই সমান; এইজন্য যোগেন মহারাজের আদেশ গিরিশবাবু কখনও লঙ্ঘন করিতেন না। গিরিশবাবু বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি কোন কাজ করিতে মনস্থ করিয়াছেন, কিছুদূর পর্যন্ত কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন, হয়ত তাঁহার সেই কার্যটি সকলের মনোনীত হয় নাই এবং সকলে তাঁহাকে নিষেধ করিতেছেন কিন্তু তর্কযুক্তিতে গিরিশবাবুর সহিত কেহ পারিতেছেন না। গিরিশবাবু নিজের প্রাধান্য ঠিক বজায় রাখিতেছেন। অবশেষে সকলে যখন পরাস্ত হইলেন, তখন যোগেন মহারাজকে কথা কহিবার জন্য সকলে অনুরোধ করিলেন। যোগেন মহারাজ গম্ভীরভাবে গোটা কতক ধমক দিলেন। গিরিশবাবু অত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ হইলেও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন, এবং বলিতেন, "এঁ্যা এঁ্যা, তুইও বারণ করিস এই কাজ কোরব না। তুই যখন বোল্‌ছিস, তোর কথাই রইল।" এই বলিয়া তৎমুহূর্তে তিনি সেই কাজ ত্যাগ করিতেন; লাভ লোক-সানের দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। তিনি গুরু-ভাইকে গুরুর ন্যায় জ্ঞান করিতেন এবং এই ভাবটি গিরিশবাবুর নিকট শিখিবার একটি প্রধান বিষয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জল খাওয়া—একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে গিয়াছেন। তাঁহার বসিবার ডান-ধারে একটি কাচের গ্লাসে করিয়া এক গ্লাস জল ছিল শশীমহারাজ নিকটে বসিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি হইল। পাছে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পড়িয়া যান, সেই জন্য শশীমহারাজ

তাড়াতাড়ি হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহার পিছনদিকে রহিলেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি সব কাজ করিতে হইয়াছিল যে উঠিবার সময় তাঁহার পায়ের আঙ্গুল জলের গ্লাসে লাগিয়া গিয়াছিল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধি ভঙ্গের পর সেই গ্লাসটা লইয়া জল খাইলেন। জলটা বদলাইয়া দিবার কাহারও অবকাশ ছিল না বা অপর কেহ সেই জিনিস লক্ষ্য করে নাই। শশীমহারাজের পা ঠেকা জলটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব পান করিয়াছিলেন, এইজন্য শশীমহারাজের চিরকাল প্রাণে একটি ব্যথা ছিল এবং অনেকবার এই বিষয়টি উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিতেন। ইহাকেই বলে নিষ্ঠা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দের অজপাজপ করা—নিরঞ্জনমহারাজ একদিন বলিতে লাগিলেন যে, একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যান এবং জপ করিবার বিষয় নানা প্রকার প্রশ্ন করেন এবং জপটা যাহাতে শীঘ্র খুব জমিয়া যায় সেইরূপ আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নিকট করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহার জিহ্বা বা অন্য কোন স্থান স্পর্শ করিয়া দেন এবং একটা শব্দ জপ করিতে বলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে এই শব্দটা সিদ্ধ বীজ। এই শব্দ জপ করিলে শীঘ্র ফল পাইবে। নিরঞ্জন মহারাজের তখন অল্প বয়স, কথার গুরুত্ব বুঝিতে না পারিয়া তিনি বাড়িতে আসিয়া রাত্রিতে সেই বীজটা একটু আধটু জপ করিতে লাগিলেন। যেমন একটু জপ করা অমনি যেন ভিতর হইতে তেজ উঠিতে লাগিল। জপ তখন আর বন্ধ হয় না। রাত্রিতে নিদ্রাও হয় না। ক্রমশঃ জিহ্বা হইতে জপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে প্রবেশ করিল এবং শেষে শরীরের সমস্ত স্থানটা যেন জপ করিতে আরম্ভ করিল। তিনি তখন মন হইতে অনেকবার জপটা তাড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু জপ তখন দ্বিগুণ জোরে হইতে লাগিল। অন্য কোন জিনিস ভাবিবার বা চিন্তা করিবার সময় রহিল না—কি দিন, কি রাত্রি অনবরত জপ চলিল।

ঘুম হইবে বলিয়া রাত্রে প্রদীপ নিবাইয়া শুইয়াছেন, কিন্তু দেখেন যেন জোনাকি পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও ভিতরে অনবরত

জপ হইতেছে। তখন তাঁহার ভয় হইল যে, একি দেখি। এইরূপে তাঁহার তিন দিন যাইলে তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে বলিলেন, "মহাশয় এ আবার কি করে দিলেন? চোখে জোনাকি পোকার মত দেখি, জপ জিব থেকে গিয়ে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জপ কচ্ছে। আমি যে রাত্রে ঘুমুতে পারি না।" তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "পরে হবে। একে কি বলে জানিস? একে বলে অজপা জপ, দেহের সমস্ত পরমাণু জপ করে। এইটা খুব উচ্চ অবস্থা না হলে কেউ করতে পারে না।" নিরঞ্জন মহারাজ তখন বলেন, "মহাশয়, আপনার উচ্চ অবস্থা এখন থাক আমি ঘুমিয়ে বাঁচি এতে যে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।" তখন হইতে সেই ভাবটা কাটিয়া যাইল।

স্বামী অভেদানন্দর, সন্ন্যাসীর আদর্শ—একবার কথা উঠিল যে সাধুর রুক্ষ মুখ, জীর্ণ ছিন্ন বসন ও নিতান্ত কৃশ দেহ হওয়াই শ্রেয়, কারণ ইহা হইলে খুব আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ হয়। বড় ঘরটিতে সকলেই বসিয়াছিলেন সকলেই নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। কালী-বেদান্তী স্থির হইয়া বসিযা সকলের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত লোক উভয় পক্ষের সমস্ত মতামত না শুনিয়া নিজের কোন মত প্রকাশ করিতেন না অবশেষে তিনি বলিতে লাগিলেন, "সাধু হয়েছি বলে নাকি চোর দায় ধরা পড়েছি যে উপোস করতেই হবে, গায়ে ছাই ভস্ম মাখতেই হবে ও ধূলা কাদায় পড়ে থাকতে হবে? সাধুর কাজ হচ্ছে জগৎকে শিক্ষা দেওয়া। সাধুকে সব বিষয় শিখতে হয় কারণ সাধারণ লোকের কার্যে যেখানে ভুল বা ত্রুটি হচ্ছে সেই ভুলটা দেখিয়ে দেওয়াই সাধুর কাজ। শুকনা সন্ন্যাসী হয়ে জঙ্গলে পড়ে থাকা আমার আদর্শ নয়। আমার আদর্শ হচ্ছে তিনি যা বলে গেছেন এবং শাস্ত্রাদিতে যা পাচ্ছি তাই সাধারণ লোককে জানাব। এরূপ শুকনো চিমড়ে সন্ন্যাসী হলে তার কথা কেউ শুনে না। কি জান, "পহেলা দর্শন ধারী পিছে গুণ বিচারী," এই বলিয়া তিনি দয়ানন্দ স্বামীর কথা তুলিলেন।

স্বামী অভেদানন্দর স্বামী দয়ানন্দের গল্প বলা—কালীবেদান্তী বলিতে লাগিলেন, "দেখ, দয়ানন্দ প্রথম ল্যাংটা সাধু হয়ে লোকের কাছে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ল্যাংটা সাধু ভিখারী, সে আবার কি জানে এই বলিয়া লোকে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু দয়ানন্দ তেজী সাধু তিনি কিছু বলবেনই বলবেন। তিনি দেখলেন ভেখ না হলে ভিক্ষা মিলে না। তখন তিনি মস্ত এক পাগড়ী মাথায় বাঁধলেন, গায়ে এক লম্বা আলখাল্লা পরলেন এবং এই সব পরে তিনি সভায় বক্তৃতা দিতে উঠলেন। আগেও যে দয়ানন্দ ছিল তখনও সেই দয়ানন্দ তবে ভোল ফেরাতে কথায় জোর এল। তখন লোকে তাঁর কথা শুনতে লাগলো, তাঁর কথা নিলে। তাই ভোল না হলে কি মানুষ কাজ করতে পারে? আনুসঙ্গিক জিনিসের জন্য সাধুর সাধুত্ব নষ্ট হয় না। যাদের লোকের সঙ্গে মিশতে হয় তাদের ভোল রাখতে হয় নহিলে কাজ চলে না।"

তিনি বলিতে লাগিলেন, "দয়ানন্দ ডাণ্ডাবাজ সাধু ছিলেন। তর্ক বিতর্কে যত হউক না হউক গালমন্দ করে সভা জিততেন। নবদ্বীপে গেলে সেখানে সব নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা দয়ানন্দকে ন্যায়েব ফাঁদে ফেলে হারাবে ঠিক করেছিলেন কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতদের বাংলায় কথা বলার অভ্যাস, সংস্কৃত বরাবর বলিতে পারেন না। দয়ানন্দ পূর্বেই সেই কথা বুঝিয়াছিলেন তাই বলিলেন যে পণ্ডিতদের সাথে কথা যখন হচ্ছে তখন সংস্কৃতে কথা হবে বাংলা ভাষায় কথা কওয়া হবে না। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে কথা কইতে গিয়ে একটু আধটু ব্যাকরণ দোষ করিলেন, এই না দেখে দয়ানন্দ গালমন্দ করে দাপট করতে লাগলেন। দয়ানন্দ তেজী সন্ন্যাসী আর পণ্ডিতরা গৃহী কাজেই মাথা হেঁট করে চুপ করে রইলেন বিশেষ আর কিছু বললেন না। দয়ানন্দ এইরূপ ডাণ্ডাবাজী করে জিতে গেলেন। তবে তিনি একটি খুব মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন। দয়ানন্দ স্বামী গোয়ালিয়র বা অন্য কোন এক মহাসভায় যান। তেজস্বী সাধু, মহারাজার দরবারে সকলেই বিশেষ সাম্মান করিল। কথাপ্রসঙ্গে

দয়ানন্দ শুনিতে পাইলেন যে মহারাজা একটি স্ত্রীলোক রাখিয়াছেন। তার বাড়িতে মহারাজা দিনরাত থাকেন আর সেই স্ত্রীলোককে নিয়ে প্রকাশ্যে ভ্রমণ করিতে বাহির হন। এই শুনিয়া দয়ানন্দ অগ্নি শর্মা! সভায় গিয়া সকলের সম্মুখে রাজাকে না ভূত না ভবিষ্যৎ গাল পাড়িতে আরম্ভ করিলেন,—এই কি হিন্দু রাজার আচার যে এক কুত্তিকে নিয়ে গাড়ি করে বেড়াইতে বাহির হবে আর প্রজারা সেই দেখে আচার ব্যবহার শিখিবে। খবর্দার ঐ কুত্তির সহিত আর কখন দেখা করবে না ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। রাজা ত অপ্রতিভ হইয়া মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন এবং সেই স্ত্রীলোকটির বাড়িতে আর দিন কয়েক গেলেন না।

স্বামী দয়ানন্দের দেহত্যাগ—রাজা না যাওয়ার জন্য সেই স্ত্রীলোকটি সমস্ত খবর লইল এবং বুঝিল যে দয়ানন্দ এই সব ঘটনা ঘটাইয়াছে। দয়ানন্দ গালের সময় গাল দিয়াছেন তারপর আর কিছু মনে নাই। স্ত্রীলোকটি মনে মনে জানে দয়ানন্দ সাধু, তাঁর মনে আর ও সব কথা এক্ষণে নাই, তিনি ভুলে গেছেন। একদিন সেই স্ত্রীলোকটি দয়ানন্দকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিল এবং মৌখিক খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাইতে লাগিল। দয়ানন্দ সরল প্রাণের সাধু, কোন দ্বিধা না করিয়া এবং অপরকে কোন জিজ্ঞাসা না করিয়া সেই স্ত্রীলোকের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে যাইলেন। স্ত্রীলোকটি কে, তাহার কি বৃত্তান্ত তিনি কিছুই জানিতেন না। সামান্য আহার করিবার পর হইতে দয়ানন্দ 'গা জ্বলছে' বলিতে লাগিলেন। দুষ্টা স্ত্রীলোকটি খাবারের সহিত বিষ দিয়াছিল এবং সেই বিষ খাইয়াই দয়ানন্দ স্বামীর দেহত্যাগ হয়। কিন্তু তিনি খুব মহত্ত্ব দেখাইলেন, সমস্ত জানিয়াও স্ত্রীলোকটিকে অভিসম্পাৎ করিলেন না। সাধু দেহত্যাগ করিতেছে, ব্রহ্মে লীন হইতেছে এই বিষয় তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং বেদান্তের আত্মার অমরত্ব প্রচার করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। এইটিই হচ্ছে দয়ানন্দের শ্রেষ্ঠ কার্য।"

কালীবেদান্তীর মুখে দয়ানন্দের এইরূপ দেহত্যাগের কথা শুনিয়া

সকলে বড় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। বর্তমান লেখকও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে কি নৃশংস আচরণ। এমন সাধুকে বিষ খাওয়াইয়া মারে! কালীবেদান্তী সেইক্ষণে উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতার ভাবে কথা কহিতেছিলেন। কালীবেদান্তীর বাক্‌পটুতা ও বহু বিষয়ের খবরাখবরে অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দয়ানন্দ স্বামীর এই শেষ খবর শুনিয়া অনেকে ব্যথিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাইয়া নীরবে বসিলেন ও এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

শিবানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক—১৮৯২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবের আয়োজন হইতেছে ও নৌকাযোগে ধীরে ধীরে লোক সকল আসিতেছে। বরাহনগর মঠ হইতে অনেকে গিয়াছেন। শশীমহারাজ, ঠাকুরের নিত্যভোগ আরতি দিয়া যাইবেন। বর্তমান লেখক পূর্বরাত্রে বরাহনগর মঠে ছিলেন। শিবানন্দ স্বামীর সহিত বর্তমান লেখকের গঙ্গাধরমহারাজের তিব্বত ভ্রমণ ও কঠোর তপস্যার কথা হইতে লাগিল। কথা বেশ জমিয়া উঠিতে লাগিল এবং প্রসঙ্গক্রমে কথা উঠিল যে তিব্বতের লোক মাখন দিয়া চা খায়। কথাটা প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল, কোন বিশেষত্ব ছিল না কিন্তু শিবানন্দ স্বামীর প্রাণটি এত নরম ও স্নেহপূর্ণ হইয়াছিল যে তিনি চট্‌ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ মহিম, ওটাই বা বাদ যায় কেন? একবার করে দেখা যাক না।" এই বলিয়া ঠাকুর ঘর হইতে সকালবেলার বাল্যভোগের মাখন ও মিছরি আনিলেন তাহতে চা মিশ্রিত করিয়া শিবানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক উভয়ে চা পান করিলেন। যদিও পান করিতে সুস্বাদু হইয়াছিল কিন্তু চায়ের গুণ অতিশয় রুক্ষ হইল এবং সারাদিন গা জ্বালা করিয়াছিল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও হুতু মুখুজ্জে—রাখালমহারাজ আলমবাজার মঠে যদিও সারাদিন জপ করিতেন ও গম্ভীর ভাবে থাকিতেন কিন্তু হাস্যকৌতুকে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসবের আয়োজন হইতেছে, প্রায় দুই সপ্তাহ আর বাকী আছে। আলমবাজার মঠে হুতু মুখুজ্জে তাঁহার বড় ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া

উপস্থিত হইলেন এবং সেই সময় বৃদ্ধ মৈত্র মহাশয়ও উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ মৈত্রমহাশয় খুব ভক্তলোক ও জাপক ছিলেন। পাঁচরকম কথাবার্তার পর রাখালমহারাজ কথা তুলিলেন, "হ্যাঁ মুখুজ্জে কেশববাবু জাহাজে করে স্বগোষ্ঠী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কিরূপে আসিয়াছিলেন"? হৃদু মুখুজ্জে বলিতে লাগিলেন, "একদিন বৈকালবেলা ক্যাশববাবু জাহাজ সাজাইয়া অনেক লোক লইয়া কীর্তন করিতে করিতে মামাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। গঙ্গার মাঝে কীর্তন হইতেছিল তাই শুনিতে অতি মধুর হইতেছিল এবং গঙ্গার উভয় পার্শ্বে অনেকে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে জাহাজখানি কালীবাড়ির ঘাটে লাগিল এবং আমিও সে সময় একটি গান বাঁধিয়া ক্যাশববাবুকে আনিবার জন্য যাইলাম। ক্যাশববাবু নামিয়া মামাকে দর্শন করিলেন এবং নানা কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন তখন আমি ক্যাশববাবুকে বলিলাম, আপনি টৌনহালে কি করে ন্যাচ্‌কার করেন? একবার এখানে ন্যাচ্‌কারটা করে আমাদের দেখান না। ক্যাশববাবু প্রথমে অসম্মত ছিলেন তাহারপর মামা বলিলেন, 'ও ক্যাশব তুমি যে টৌনহালে ন্যাচ্‌কার কর একবার সেই রকম করে ন্যাচ্‌কার দাওনা।' ক্যাশববাবু বলিলেন 'কামারের কাছে কি ছুঁচ ফাঁকি দেওয়া চলে?' যাহা হউক বড় ঘাটটিতে গিয়ে গরমকালে বৈকালবেলা গঙ্গার দিকে মুখ করে ক্যাশববাবু ন্যাচ্‌কার করতে লাগলেন। তাঁহার মুখদিয়ে যেন ফুল ফুটতে লাগলো। তা বাপু আমি মুখ্যু-শুখ্যু-মানুষ আমি অতমানে বুঝতে পারি নি কিন্তু মামা খানিকক্ষণ বাদে ঘরে চলে গেলেন। ক্যাশবাবুও আর খানিকক্ষণ বলে মামার ঘরে এসে বসলেন। তারপর ওদের কি কথা হলো। সে কেমন জাহাজ! কতলোক, কেমন কীর্তন গাওয়া! আমি ত মাঝে মাঝে মুখে কীর্তন বেঁধে গাইলুম; তারপর ক্যাশববাবু চলে গেলেন।"

হৃদু মুখুজ্জের পঞ্চবটীতে তপস্যা করা—তাহারপর পুনরায় হৃদু মুখুজ্জে বলিলেন, "আমি তো মামার সঙ্গে পঞ্চবটীতে বসে সাধনা

করেছিলুম। মামা আমায় বলেছিলেন, 'শ্যালা ওখানে যাসনি ও পঞ্চবটীতে ভৈরব থাকে তোকে কোন দিন তাড়া দিবে।' আমি কিন্তু মামার কথা শুনেও দিনকতক রাত্রে ওখানে গিয়ে বসতুম। একদিন ভৈরবের তাড়া খেয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে মামার কাছে এলুম এবং বল্লুম, 'কি এক বিরাট চেহারা আমায় ভয় দেখাচ্ছে?' মামা শুনে বল্লেন, "দুঃ শ্যালা তুই ওখানে গেলি কেন?"

তাহারপর রাখালমহারাজ হৃদু মুখুজ্জেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ মুখুজ্জে তুমি জোয়ান বয়সে খুব বলবান ছিলে, বেশ ষণ্ডা গুণ্ডা ছিলে, এমন পট্‌কে গেলে কেমন কবে?" হৃদুমুখুজ্জে বলিলেন, "আব দাদা, ছয় ছটা ভৈববী চক্রে রাত্রে ঘুরতুম। তখন দক্ষিণেশ্বব আলম-বাজারের কাছে অনেক ভৈববী চক্রেব আড্ডা ছিল। বাত্রে পাঁচ ছটা চক্রে ঘুরলে আর কি শরীব থাকে", এই বলিয়া হৃদুমুখুজ্জে চক্রেব কথা তুলিলেন। রাখাল মহারাজ বলিলেন, "তোমাব ছেলে বসে আছে ও সব কথা বলছো?" হৃদু মুখুজ্জে পেছন দিকে ছেলের পানে চাহিয়া বলিলেন, "এ মহাভারতের কথা, এ শুনতে ছেলেব দোষ নাই", এই বলিয়া আবার ভৈরবী চক্রেব কথা বলিতে লাগিলেন। রাখালমহাবাজ কথাটা বন্ধ কবিয়া দিয়া মৈত্র মহাশয়েব দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আচ্ছা মৈত্র মহাশয় আপনি তো মুখে মুখে ছড়া বলিতে পারেন। আচ্ছা আপনি হলেন দাশুরায় আর মুখুজ্জে হলো, কি হে বল না কি নাম তোমার হবে?" হৃদু মুখুজ্জে অপব একটি তরজাওয়ালার নাম গ্রহণ করিয়া দুইজনে তরজা গাইতে লাগিয়া যাইল। মৈত্র মহাশয়ের দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছিল সেইজন্য তাঁহার কথা যোগাইতে একটু বিলম্ব ও অস্পষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু হৃদু মুখুজ্জে ছড়াটি শুনিবামাত্র তরজা করিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল। এইরূপে দুইজনায় বেশ তবজা অনেকক্ষণ চলিল তাহার পর রাখালমহারাজ বন্ধ করিয়া দিলেন।

রামচন্দ্র দত্তের দক্ষিণেশ্বর গমন—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণেশ্বরের উৎসবে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত কাঁকুড়গাছির ভক্তমণ্ডলী লইয়া

দক্ষিণেশ্বরে যান এবং ঠাকুরের ঘরের উত্তর দিকের দালান ও সিড়িতে বসিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের গৃহে শূন্য শয্যা দেখিয়া তাঁহার প্রাণটা বড় ব্যথিত হইয়া ছিল এবং তিনি ভক্তি ও শোকে বিভোর হইয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পূর্ব পরিচিত যাঁহারা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ বা প্রণাম করিতে আসিলেন তিনি তাঁহাদের সকলের সহিত কোলাকুলি ও স্নেহপূর্ণস্বরে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন কিন্তু মনটা বড় বিষণ্ণ, বেশী কথা কহিবার সামর্থ ছিল না। প্রথমে শশীমহারাজ ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তকে দেখিয়া সিংহের ন্যায় তর্জন গর্জন করিয়া, 'এই যে রা'ম দাদা এসেছে' বলিয়া একেবারে জড়াইয়া ধরিলেন। শশী মহারাজের কি সিংহ বিক্রম ও গগনভেদী চীৎকার! বহুদিন পরে সাক্ষাৎ হওয়ায় শশীমহারাজের ভালবাসা শ্রদ্ধা-ভক্তি যেন সহস্রগুণ উথলিয়া উঠিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিতে লাগিল।

আলমবাজার মঠের উৎসব—এই উৎসবের পর আলমবাজার মঠে রবিবার একদিন একটি ছোট উৎসব হয়। ইহা কেবল আত্মগোষ্ঠীর জন্য, সাধারণ লোকদিগকে কিছু বলা হয় নাই তবুও প্রায় তিন শত লোক হইয়াছিল। বাবুরামমহারাজ বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া অনেক জায়গায় নিমন্ত্রণ করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তর নিকট গিয়া বিশেষ ভাবে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন এবং তিনিও স্বগোষ্ঠী লইয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। উৎসবের দিন তিনি আলমবাজার মঠে যান এবং সকলের সহিত খুব মেলামেশা ও আদর সম্ভাষণ ও মহাআনন্দ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সেইদিন প্রথমবার প্রায় সকল পুরাণ ভক্তের সমাবেশ দেখা গিয়াছিল। সকলেই সেদিন বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নানা প্রকার কথাবার্তা হইতে লাগিল। এইরূপ জমাট ভক্ত সমাবেশ খুব কম হইয়া থাকে।

দীন মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ)—দীনমহারাজ একবার বলিয়াছিলেন, তিনি যখন একাকী রাজপুতানায় ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত এক জৈন ভক্তের সাক্ষাৎ হয়। ভক্তটি একখানি গরুর গাড়ি করিয়া যাইতেছিলেন এবং দীনমহারাজকে অনেক অনুনয় করিয়া সঙ্গী করিয়া লন। সেই শেঠজী অতি সসম্ভ্রমে করজোড় করিয়া দীনমহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ এখানে গাড়ি থামাব কি না আজ্ঞা হয়, মহারাজ জল আনতে যাব কি আজ্ঞা হয়, মহারাজ এখানে উনুন করিব কি আজ্ঞা হয়, মহারাজ এখানে উনুন জ্বালিব কি আজ্ঞা হয়", এইরূপ সকল বিষয়ে আজ্ঞা উল্লেখ না করিয়া কোন কাজ করিত না। তাহার কথাবার্তা শুনিয়া দীনমহারাজের ধারণা হইল যে লোকটি পরম ভক্ত সেইজন্য সাধুকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেছে। এইরূপে দীনমহারাজের তিনদিন কাটিয়া গেল, চতুর্থ দিবসে দীনমহারাজের সহিত আর একজন সাধুর দেখা হয় ও দীনমহারাজ সেই সাধুর নিকট শেঠজীর কথা উল্লেখ করেন। সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি দীনমহারাজকে বলিলেন, "এ মহারাজ, ও শেঠজী জৈন, পোকা মাকড় পাছে মারা যায় সেইজন্য আপনার ঘাড়ে পাপ চাপাচ্ছে; আর ঐ জন্যেই প্রত্যেক কার্যে আপনার অনুমতি চাইছে। আজকে এক তামাসা করবেন, ও যখন উনুন জ্বালাবার আদেশ নেবে আপনি তখন বলবেন যে গরুর গাড়ির ছাপ্পরের উপর উনুন জ্বালাও তাহলে সব কথা বের হয়ে পড়বে।" দীন মহারাজ শুনিয়া ত অবাক! তাহারপর শেঠজী যখন উনুন জ্বালাবার আদেশ চাহিয়াছে তখন দীনমহারাজ বলিলেন, "গাড়ির ছাপ্পরের উপর চুলা কর", এই কথা শুনিয়াই শেঠজী বিষণ্ণ হইয়া পড়িল এবং বলিল, "এ কিয়া আজ্ঞা মহারাজ।" দীনমহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইলেন এবং তাহাকে বলিলেন, "তোমার ও সব মৌখিক ভক্তি, পাপটা সাধুর ঘাড়ে চাপাবার জন্য তুমি এত কথা কইছ, তোমার অন্ন খাব না।"

দীন মহারাজ ও জনৈকা বালিকা—আর একদিন দীনমহারাজ

রাজপুতানায় এক গৃহস্থের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন এবং ভিক্ষা চাহিলে গৃহস্থের একটি ছোট মেয়ে তাহার নিজের হাতের পেঁজা তুলা খানিকটা আনিয়া দীনমহারাজকে দিতে চায়। দীন-মহারাজ তাহা দেখিয়া বলিলেন যে তিনি সাধু, সামান্য একটু রুটির আবশ্যক, তুলা লইয়া কি করিবেন। মেয়েটি কিন্তু আব্দার ধরিল যে তুলা লইতে হবেই। দীনমহারাজ অনিচ্ছুক কিন্তু ছোট মেয়েটি কান্না সুরু করিল ; আগত্যা তিনি তুলা লইলেন এবং লইয়া যে কি করিবেন তাহা তিনি জানিতেন না। অল্পদিন পরে এমন শীত পড়িল যে তুলাভরা জামা না হইলে আর তাঁহার চলে না। তখন দীনমহারাজ সেই তুলাটুকু বাহির করিয়া একজনকে দিলেন এবং সেই লোকটি দীনমহারাজকে একটি তুলাভরা জামা তৈয়ারি করিয়া দিলেন। দীনমহারাজ তখন মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "আমি নিঃসঙ্গ, নিঃসম্বল হইয়া একাকী ঘুরে বেড়াই ভগবান সেইজন্যই আগে হইতে শীত নিবারণের জন্য তুলাটুকু ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন, ধন্য ভগবান !"

একবার দীনমহারাজ শুধু পায়ে যাইতেছিলেন। একটি লোক অতি আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে এক জোড়া জুতা পরিতে অনুনয় করিলেন। দীনমহারাজ তাঁহার জুতা লইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু সেই লোকটি জুতা দিবার জন্য অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। অবশেষে দীনমহারাজ তাঁহার প্রদত্ত একজোড়া জুতা লইলেন। কিছুদিন পরে রৌদ্র অতিশয় প্রখর হইয়া পথের কাঁকর বালি তাতিয়া উঠিল এবং জুতা না হইলে রাস্তায় আর পা দেওয়া যায় না। তখন দীন মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, জুতা জোড়া যেন ঠিক সময় জুটিয়া গিয়াছিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অধ্যয়ন—আলমবাজার মঠে দুপুরবেলা একটু সময় পাইলেই শশীমহারাজ মাঝে মাঝে মার্ক টোয়েনের "ইনোসেণ্ট এ্যাট হোম (Innocent At Home) ও ইনোসেণ্ট এ্যাব্রড" (Innocent Abroad) নামক দুইখানি হাস্য কৌতুকের

গ্রন্থ পাঠ করিতেন। তিনি মুখভঙ্গি ও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করিয়া নানা ভাবভঙ্গি করিয়া বই দুইখানি এমন করিয়া পড়িতেন যে সকলে তাহা শুনিয়া হাসিয়া লুটোপুটি খাইতেন। তিনি মাঝে মাঝে এইরূপ হাস্য কৌতুক করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন এবং কৌতুকচ্ছলে অভিনয়ের ভাবে পড়িতেন। পুস্তক পাঠ করিবার তাঁহাব একটি বিশেষ ক্ষমতা ছিল।

গঙ্গাধর মহারাজের নানান কথা বলা—গঙ্গাধর মহারাজ রাজপুতানা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া অল্পদিন আলমবাজার মঠে রহিলেন। তাঁহার কথা কওয়া অভ্যাসটি বড় বেশী হইয়া গিয়াছিল; খেতড়ির রাজার কথা, গুজরাটের কথা, তিব্বতের কথা শেঠেব বাড়িতে চা খাওয়া ও সেই সঙ্গে বিষ খাওয়ান এবং কবিরাজেব কথা তিনি অনবরত কহিতে লাগিলেন। চীন পর্যটকের কি গ্রন্থ আছে 'ফুলোকি' 'সিয়োকি' তিব্বতী কি চীন শব্দ যাহাই হউক তাহাই তিনি বলিতেন। কথা অতিরিক্ত হওয়ায় সকলেই গঙ্গাধর-মহারাজকে হাসি তামাসা করিতে লাগিলেন। প্রথমে রাখাল-মহারাজ সুরু করিলেন তাহারপর কালীবেদান্তী ও তুলসীমহারাজ নানাপ্রকার ঠাট্টা তামাসা সুরু করিতে লাগিলেন। বালক স্বভাব গঙ্গাধরমহারাজ মাঝে মাঝে তথা হইতে উঠিয়া গিয়া বলিতেন, "না ভাই তোমরা যদি সকলে অমন করে ঠাট্টা কর তাহলে আমি থাকবো না। আর তো নরেন নাই যে আমাকে ভালবাসবে, যে ভালবাসতো সে তো এখন উধাও, আমিও চলে যাচ্ছি," এই বলিয়া বালকের ন্যায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বড় ঘরটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। আবার সকলে ছোট ছেলেকে যেমন আদর করে তেমনি করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেন। গঙ্গাধর মহারাজ বালকের ন্যায় অকপটভাবে এবং অভিমানের ছলে রাগ করিয়া যে সব কথা বলিতেন তাহার ভিতরও একটা প্রগাঢ় ভাসবাসা থাকিত।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিরাশ্রয় ভাব—বহুদিনের পর একদিন রবিবারে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত রাখালমহারাজ ও গঙ্গাধরমহারাজ

উভয়কে খাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাখালমহারাজের ভাব তখন নিতান্ত নিরাশ্রয় বালকের মত, বিনয়ী বা সেইরূপ অন্য কোন শব্দ তাঁহাব প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। নিজের ইচ্ছা বা শক্তি যেন কিছুই নাই, বাহিরের একটা কি মহাশক্তি বা অন্য কোন পদার্থ যেন তাঁহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। সে সময় তাঁহার নিরাশ্রয় ভাব দেখিলে সকলের মনে কষ্ট হইত। কেহ কিছু বলিলে তিনি বলিতেন, 'হ্যাঁ তাহাই বটে, তাহাই বটে।' কি ছোট কি বড় সকলের কাছে তিনি বিনয়ী হইয়া থাকিতেন ও ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেন। কেহ যেন তাঁহাব কথায় বা কার্যে কষ্ট না পায় সেই জন্যেই তিনি অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে সকলেব সহিত কথা কহিতেন। জগৎ-সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যেন কোন স্থলে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং কেহ কোন কথা কহিলে বা ডাকাডাকি করিলে তিনি যেন অন্য জগৎ হইতে নামিয়া আসিয়া জগৎটা দেখিতেন ও উপস্থিত মত দুই একটি কথা কহিয়া অতি দীন হীনেব ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ—রবিবার ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে দুই জনায় যাইলেন এবং ১১ টার মধ্যে আহার সমাপন করিয়া উঠিয়াছেন এমন সময় বর্তমান লেখক তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখালমহারাজের অভ্যাস ছিল যে আহারের পর আধ ঘণ্টা শুইয়া থাকা, এটা তিনি কৌতুক করিয়া রাজনীতি বলিতেন। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বাড়ির পূর্ব দিকের ঘরের মেঝেতে রাখালমহারাজ শুইয়া পড়িলেন। রামচন্দ্র দত্ত বলিতে লাগিলেন, "ও রাখাল তুই শুয়ে পড়েছিস কেন, ঘুমুবি নাকি? তুই সাধু হয়েছিস ঘুরে বেড়াস এখনও খেয়ে দেয়ে ঘুম!" রাখালমহারাজ বলিলেন, "রাম দাদা, একটু সবুর কর আধ ঘণ্টা একটু ঝিমিয়ে নিই। এটা হচ্ছে কি না রাজনীতি, একটু সবুর কর।" এই বলিয়া শুইয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন। রাখাল-মহারাজের সহিত রামচন্দ্র দত্তের পূর্বাশ্রমের শ্যালা ভগ্নীপতি সম্পর্ক

ছিল কারণ রাখালমহারাজ মনোমোহন মিত্রের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মনোমোহন মিত্র রামচন্দ্র দত্তের মাসীর পুত্র সেইজন্য রামচন্দ্র দত্তের সম্পর্কে ভগ্নীপতি হইল। সে যাহা হউক বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে ও এক বাড়িতে থাকায় অতিশয় ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। রাখালমহারাজ ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তকে অতিশয় সম্মান করিতেন।

গঙ্গাধর মহারাজের কথা—রাখালমহারাজ নিদ্রা যাইলে বর্তমান লেখকের সহিত গঙ্গাধরমহারাজের কথা আরম্ভ হইল। গঙ্গাধর-মহারাজ কোন্ কোন্ দেশে গিয়াছিলেন এবং তথায় কি কি ঘটনা হইয়াছিল তাহাই বিবৃত করিতে লাগিলেন। গঙ্গাধর মহারাজ কথা প্রসঙ্গে বলিলেন, "আয়ুর্বেদে লেখা আছে যে গর্ভিনীকে গর্ভ অবস্থায় মাংস খাওয়াতে হয়" এই বলিয়া তিনি কবিরাজী গ্রন্থ হইতে শ্লোক বলিতে লাগিলেন। সন্তানকে খুব সঙ্গীতে পারদর্শী করিতে হইলে গর্ভিনীকে মৎস্য খাওয়াইতে হয় এবং ধার্মিক, বাগ্মী, পণ্ডিত, বীরপুরুষ ও যোদ্ধা ইত্যাদি করিতে হইলে গর্ভিনীকে বিশেষ বিশেষ প্রকারের মাংস খাওয়াইতে হয়। তিনি আরও বলিলেন যে কবিরাজী গ্রন্থে কোন মাংস ত্যাগ করে না এমন কি ব্যাঘ্র, হাড়গিলে ও শকুনি প্রভৃতিরও মাংস নানা রকম রোগে ব্যবহারের উল্লেখ আছে। এমন সময় রাখালমহারাজ চাদরটি মুড়ি দিয়া উঠিয়া বসিয়া কথাবার্তা শুনিতে লাগিলেন। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত বলিলেন, "দেখ রাখাল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য যাহা করিয়া যাইবে ভবিষ্যতে সেই নজির সকলে চালাইবে সেইজন্য এখন হইতে সকলের অতি সংযত হইয়া চলা আবশ্যক। তা দেখ, একেই তো তোমরা তাঁর ভক্ত, তার উপর তাঁর ভাব লইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছ। তোমরা হচ্ছো ত্যাগী-ভক্ত আমরা হলুম গৃহী-ভক্ত, তোমাদের আর মাছ মাংস খাওয়া উচিত নয়। জাননা তাঁর কথাটা ছিল, গুরু মুতে দাঁড়িয়ে, তো চেলা মুতে পাক্ মেরে মেরে। তোমরা ভাই মাছ মাংস খেয়ো না এটা ভাল দেখায় না আর লোকে নিন্দে করে।"

রাখালমহারাজ আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমরা আর মাছ খাই কবে? বাহিরে যখন থাকি পরের বাড়িতে খাই সেখানে যা দেয় তাই চুপ করে খাই। মাছ মাংস উঠে গেছে তবে বাঙ্গালা দেশে এসেছি কেউ শ্রদ্ধা করে মাছ দিলে তা বাঙ্গালী আমরা একটু আধটু খেয়ে থাকবো।"

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের গল্প বলা—তাহারপর কথা উঠিল ঈশ্বর আছেন কিনা এবং তাঁহাকে জানা যায় কি না। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত বলিতে লাগিলেন, "একবার এক মহাতার্কিক লোক আমার নিকট আসেন এবং ঈশ্বর নাই এইরূপ প্রতিপন্ন করিতে চান। আমি তাহার কথার সেদিকে কোন জবাব না করিয়া বলিলাম, তোমাব বাপ যে অমুক লোক তুমি কি করে জানলে কারণ মা তোমায় বলে দিয়েছেন সেইজন্যই তো তুমি অমুক লোককে বাপ বলে থাক, তা ছাড়া তোমার আর তো কোন প্রমাণ নেই। যদি এই তোমার জীবনের ব্যাপার হইয়া থাকে তাহা হইলে গুরু বলে দিযেছেন ঈশ্বর আছেন সে কথা তোমার মেনে চলা উচিত।" গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন, "কেন শরীরের সৌসাদৃশ্য পিতা পুত্রের একই প্রকারের হয়, মানসিক বৃত্তি এক প্রকারের হয়। মা না বলে দিলেও লোকে আপন আপন পিতা নির্ণয় করে নিতে পারে।" ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত বলিলেন, "না রে গঙ্গা না, সব জায়গায় ঠিক হয় না অনেক জায়গায় গোল হয়ে যায়," এইরূপে দুইজনে তর্ক করিতে লাগিলেন। যাহা হউক তর্কটি থামিয়া গেল, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত পুনরায় মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন এবং রাখালমহারাজ ও গঙ্গাধরমহারাজ তাহাতে বিশেষ সম্মত হইলেন না। কারণ ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত বৈষ্ণব বংশীয় ও বৈষ্ণব ভাবের লোক। তাঁহার পিতামহ কুঞ্জ বিহারী দত্ত (কুচিল দত্ত) বৈষ্ণবদিগের মধ্যে খুব উচ্চ অবস্থার লোক ছিলেন ও সকলে তাঁহাকে গোঁসাইজী বলিতেন। তাঁহার অনেক মন্ত্র-শিষ্যও ছিল এবং অনেক ব্রাহ্মণও তাঁহার কাছে মন্ত্র লইয়াছিল। তখন তাঁহার বাটি ছিল

নারকেলডাঙ্গায় যেখানে বর্ত্তমানে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি হইয়াছে। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের পিতা নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। তিনিও খুব জাপক ও বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত যদিও দশ বারো বৎসর হইতে নরেন্দ্রনাথের বাড়িতে বাস করিয়াছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথের বংশ শাক্ত ও অতিশয় মাংসাহারী কিন্তু ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত কখনও মাংস আহার করেন নাই; তাঁহার নিজের বংশগত ভাব তিনি বরাবর ঠিক রাখিয়াছিলেন। মাংস আহার করিতে দেখিলে প্রকৃত তাঁহার বড় কষ্ট হইত এবং এমন কি অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে তিনি বমি করিয়া ফেলিয়াছেন। যহা হউক কথাবার্তা সমাপ্ত করিয়া রাখালমহারাজ, গঙ্গাধরমহারাজ ও বর্ত্তমান লেখক তিনজনে উঠিয়া সন্নিকটস্থ রামতনু বসুর গলির বাড়িতে যাইয়া তামাক খাইতে লাগিল। ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে তামাক সেবন নিষেধ ছিল। বাল্যকালে তাঁহার বড় হাঁপানি ব্যারাম হইয়াছিল তাঁহার পিসি ও পিসতুত ভগিনি অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের মাতামহী ৺তারকেশ্বরে হত্যা দেওয়ায় আদেশ পাইয়াছিলেন যে, রামচন্দ্র দত্ত যেন কখন তামাক সেবন না করে এবং একটি জিনিস পাইয়াছিলেন সেইটি সোনার মাদুলির ভিতর রাখিয়া ধারণ করিয়া বরাবর থাকিতেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পায়স খাওয়ান—গিরিশবাবু রবিবার বা অন্য কোন দিনে একটু অবসর পাইলে আলমবাজার মঠে যাইতেন ও তথায় প্রসাদ পাইয়া সমস্ত দিন থাকিয়া, বৈকালে বাড়িতে ফিরিয়া আসিতেন। গিরিশবাবু মঠে উপস্থিত থাকিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামীজীর বিষয় নানাপ্রকার কথাবার্তা হইত। একেই তাঁহার কথাবার্তা কহিবার শক্তি অদ্ভুত ছিল, তাহার উপর তিনি অনেক সময় উত্তেজিত হইয়া অভিনয়ের ভাবে কথাবার্তা কহিতেন। সকলেই অবাক হইয়া বসিয়া গিরিশবাবুর কথা শুনিতেন। প্রসঙ্গক্রমে গিরিশবাবু একদিন বলিলেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব একদিন ৺মা কালীর প্রসাদী একবাটি পায়স লইয়া বসিয়া

আছেন এবং অনবরত বলিতেছেন, 'এই পায়স গিরিশের জন্য রাখিয়াছি।' বালকের ন্যায় হাত চাপা দিয়া বাটিটি আগলাইয়া রাখিয়াছেন। উপস্থিত আর সকল ভক্ত কৌতুক করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'কেন মহাশয় পায়স শুধু গিরিশের জন্য ? আমরা কি কেউ নয় ? কিন্তু তিনি বালকের ন্যায় অনবরত বলিতে লাগিলেন— 'এ গিরিশের জন্য, গিরিশ এসে খাবে।' কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিল —'গিরিশের কি আসবার কথা আছে ? গিরিশকে কি আপনার খবর দেওয়া হয়েছে ? কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, 'না, গিরিশ এসে খাবে, গিরিশ এক্ষনি আসবে।' অল্পক্ষণ পরেই গিরিশবাবু গাড়ি করিয়া যাইযা উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশবাবুকে দেখিয়াই ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিলেন, 'ও গিরিশ, তোর জন্যে এই পায়স রেখেছি, তুই খেয়ে নে, ওরা খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করতে চাচ্ছে' —এই বলিয়া বাঁ হাত গিরিশবাবুর কাঁধে দিয়া মা যেমন আট বছরের ছেলেকে মুখে তুলিয়া তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয়, তিনিও তেমনি ডান হাতে করিয়া একটু একটু করিয়া গিরিশবাবুর মুখে দিতে লাগিলেন। অবশেষে বুড়া আঙ্গুল দিয়া বাটি চেঁচে বাটির গায়ে যেসব লেগে ছিল, তাহাও চেঁচে খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন,—'যা গিরিশ আঁচাগে যা।' গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য ব্যাপার ! আমি গিরিশ ঘোষ, বুড়ো মিন্সে, কলকাতার বদমাস গুণ্ডার সর্দার, থিয়েটারে ভাঁড়ামো করি, কত বদ খেয়ালি করি. কলকাতার ভিতর বদমাইসিতে সকলের টেক্কা, কিন্তু তিনি যখন বাঁ হাত আমার কাঁধে দিয়ে ডান হাত দিয়ে আমার মুখে পায়স দিতে লাগিলেন তখন আমি যেন সমস্ত ভুলে গিয়ে সাত আট বৎসরের শিশু বালক হয়ে গেলুম। হ্যাঁ-না বলবার বিদ্যে-বুদ্ধি ও সব যা কিছু বল, সব যেন কোথায় চলে গেল। ইহা যে কি অদ্ভুত ভালবাসা—কি জিনিস তা বলবার নয়।" গিরিশবাবু বাহিরের বারান্দায় বসিয়া হুকা করিয়া তামাক খাইতে খাইতে এই

কথাগুলি বলিতেছিলেন। বলিতে বলিতে তিনি যেন ভাবাবিষ্ট হইলেন, হুঁকাটি হাত হইতে নামাইয়া রাখিলেন এবং স্থির হইয়া গম্ভীর ভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন, আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নরেন্দ্রনাথকে মাংস খাওয়ান—গিরিশবাবু আর একদিন আর একটি কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন একবাটি ৺মা কালীর প্রসাদী মাংস লইয়া বসিয়া আছেন। নরেন আসিলে তাহাকে খাওয়াইবেন, এইরূপ প্রতীক্ষা করিতেছেন। উপস্থিত সকলে বালকের ন্যায় কৌতুক করিয়া মাংস চাহিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তিনি সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিয়া নরেন্দ্রের জন্য মাংস রাখিয়া দিলেন। অবশেষে নরেন্দ্রনাথও হঠাৎ যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বাটিশুদ্ধ মাংস খাওয়াইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন তৃপ্ত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ—গিরিশবাবু একদিন বলরাম বাবুর বাড়িতে খাওয়ার কথা বলিতে লাগিলেন, "আমি ও নরেন পাশাপাশি বসিয়াছি। যত আম আমার পাতে দিচ্ছে সবগুলি মিষ্টি, আর নরেনকে যতগুলি দিচ্ছে সব টক হচ্ছে। এইতে নরেন চটে গিয়ে আমাকে বল্লে, 'শ্যালা, জি, সি, তোর পাতে যত মিষ্টি আম আর আমার পাতে যত টক; নিশ্চয়ই তুই শ্যালা বাড়ির ভিতর গিয়ে বন্দোবস্ত করে এসেছিস।' আমি বললাম, 'আমরা গৃহী, সংসারী, আমরাই মজা মারবো। তুই শ্যালা সন্ন্যাসী ফকীর পথে পথে ঘুরে বেড়াবি, তোদের কপালে ত সুঁটকো টোকো জুটবে।' এইতে লেগে গেল দু'জনায় ঝগড়া, তারপর দু'জনায় খুব খানিকক্ষণ হাসলুম। আমিও তর্কে কম যাইনি। নরেন যদিও তার্কিক বটে, তবে আমিও তর্কে কম যাইনি। ঝগড়া করে এমন আর কাহার সঙ্গে সুখ হয় না। সে ঝগড়াটাও কি মিষ্টি লাগতো।" তাহারপর গিরিশবাবু খানিকক্ষণ মৌন হইয়া বসিয়া থাকিয়া কি ভাবিলেন, তাঁহার সমস্ত মুখের ভাব-ভঙ্গি বদলিয়া গেল। পুনরায়

অন্যস্বরে ও অন্যভাবে বলিতে লাগিলেন, "কি অশুভক্ষণে দু'জনে দেখা হয়েছিল যে একদিনও একটি মিষ্টি কথা বলতে পারলুম না; কেবল বরাবর ঝগড়াই করলুম ও গাল-মন্দ করলুম। তার সঙ্গে ঝগড়া গাল-মন্দ না করলে যেন আমার সোয়াস্তি হতো না, বুকটা যেন খোলোসা হতো না। এমন লোক খুব কম পাওয়া যায় যে একটা কথা কয়ে সুখ হয়—মিষ্টি কথাই হউক আর রুক্ষ কথাই হউক, সবই যেন মিষ্টি।"

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নরেন্দ্রনাথের জন্য ব্যাকুল ভাব—একদিন গিরিশবাবু বর্তমান লেখক এবং আর দুই একজনকে সঙ্গে লইয়া একখানি গাড়ি করিয়া আলমবাজার মঠ হইতে বাগবাজারে আসিতেছিলেন। গিরিশবাবুর সেদিন মনটা বড় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি নরেন্দ্রনাথকে অনেক দিন দেখেন নাই, সেইজন্য সমস্ত পথটা শোক প্রকাশ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথের জননীর মনে পুত্র-অদর্শনে কি কষ্ট হইতেছিল, সেই সমস্ত কথা বলিতে বলিতে গিরিশবাবু যেন কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সেদিনের মনের ভাব এমন নরম হইয়াছিল যে নরেন্দ্রনাথ যদি হাওয়া-যোগে চড়িয়া শীঘ্র উপস্থিত হন, তাহা হইলে যেন তাঁহার মন সুস্থির হয়। গিরিশবাবুর এইরূপ শোকের ও কাঁদ কাঁদ ভাব খুব কম দেখা গিয়াছে। তিনি যেন ছোট শিশু অনেক দিন নিজের খেলুড়েকে দেখেন নাই, সেইজন্য এত ছটফট করিতেছেন। গিরিশবাবু সমস্ত পথটি নরেন্দ্রনাথের নানারূপ গুণগান করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন যে, নরেন ফিলজফি বোঝে, ঢের পড়েছে, সে যখন সেরিব্রাম (Cerebrum) সেরিবেলাম (Ceribellum) মেডুলা অবলঙগেটা (Medulla oblongata) প্রভৃতি শরীর তত্ত্বের কথা বলে তখন তার মুখে শুনায় ভাল। আর যখন জনৈক ব্যক্তি নরেনের নকল করিয়া বলিতে চায়, তখন অতি বিরক্ত বোধ হয়। জনৈক ব্যক্তি কেবল নরেনের নকল করিতে যায়, পড়াশুনা কিছু নাই, তাই শুনতে বেতালা বোধ হয়।

গিরিশবাবুর গল্প বলিবার ক্ষমতা—গিরিশবাবু অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন। নানা বিষয়ের এত গল্প তিনি জানিতেন যে এরূপ লোক খুব অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। কি শোক, কি হর্ষ, কি ক্রোধ যখন যে ভাবের কথা তিনি মুখ দিয়া এবং হস্ত সঞ্চালন দ্বারা বলিতেন তখন শ্রোতারা স্পষ্টই যেন তাহা চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইত। গিরিশবাবুর নিজের কিন্তু শোকও নাই, হর্ষও নাই, ক্রোধও নাই। তিনি বলিতেন, "নিজেকে বক্তব্য বিষয় থেকে পৃথক রাখিতে হয়। নিজে অভিভূত হইলে জিনিসটা নষ্ট হইয়া যায়। বক্তব্য বিষয়টি ঠিক চোখে দেখিতে হয় এবং মানস-চক্ষে দৃষ্ট বস্তুটি ধীরে ধীরে বর্ণনা করিয়া যাইতে হয়; ইহাই হইতেছে গল্প লিখিবার বা বলিবার রহস্য। নিজের ভিতর চাঞ্চল্যভাব আসিলে জিনিসটি ঠিক প্রকাশ করা যায় না।" গিরিশবাবুর এই বর্ণনা করিবার ভাব ও ক্ষমতা বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত ছিল। কি লেখা, কি গল্প, কি ঔষধ দেওয়া সকল বিষয়েই তাঁহার এই ভাবটি পরিলক্ষিত হইত। সকলে হাসিয়া লুটাপুটি খাইতেছে কিন্তু তিনি যেন ঠিক মুখস্ত পড়া বলে যাচ্ছেন। নিজের মনকে দ্বিধা করিবার শক্তি তাঁহার বিশেষ ছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের থুথু করা—গিরিশবাবু যদিও খুব পণ্ডিত, ধীর ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি কাহারও উপর বিরক্ত হইতেন তখন তিনি বালকের ন্যায় থুথু করিয়া অনবরত থুথু ফেলিতেন। বালকেরা যেমন পরস্পরকে থুথু দেয় তিনিও ঠিক বালকের ন্যায় আপনাআপনি থুথু করিতেন। তাঁহার সেই ভাব দেখিয়া অনেকে হাসিতেন।

গিরিশবাবুর একটি কথা ছিল, 'যদি শরীরটা রাখিতে চাও, তা'হলে ক্ষুধা পাইলে খাইবে ও ঘুম পাইলে ঘুমাইয়া লইবে, এ বিষয়ে চক্ষু-লজ্জা বা কাহারও খাতির রাখিবে না।' তিনি কার্যে ব্যস্ত আছেন, ঘরে অনেক লোক বসিয়া আছেন, কিন্তু ক্ষুধা পাইলে তিনি ঠিক উঠিয়া আহার করিয়া লইতেন এ বিষয়ে তাঁহার কোন দ্বিধা ছিল না। সেইজন্য গিরিশবাবুর অন্তিমকাল পর্যন্ত মস্তিষ্ক ও

শরীর সবল ছিল, মস্তিষ্কের দুর্বলতা তাঁহার কখন দেখা যায় নাই। তাঁহার নিকট হইতে ইহা একটি বিশেষ শিখিবার বস্তু।

জনৈক ব্যক্তির বিল্বমঙ্গল অভিনয় দর্শন—গিরিশবাবু 'বিল্বমঙ্গল' নাটকখানি দুই একরাত্রি অভিনয় হইয়াছে। বর্তমান লেখক প্রাতে বলরামবাবুর বাড়িতে যাইতেছিলেন। বলরামবাবুর বাড়ির রাস্তাতে একজন বৃদ্ধ লোক সাদা দাড়ি, সাদা সাদা ঝাঁকড়া চুল মাথায়, হাতে একটি মোটা লাঠি লইয়া রাস্তায় পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং চেনা অচেনা যাহাকে পাইতেছেন তাহাকেই ধরিয়া বলিতেছেন "ওহে শুনেছ, গিরিশবাবু কি বলেছেন? এ কথা পুরাণেও লেখা নাই, ব্যাসও একথা কখন বলেন নাই, অতি নূতন কথা—গিরিশ ঘোষই প্রথমে এ কথা বলেছেন। শুনেছ কি কথাটা? কৃষ্ণ দর্শনের ফলই কৃষ্ণ দর্শন! মুক্তি নয়, বৈকুণ্ঠ নয়, স্বর্গ নয়, কিন্তু কৃষ্ণ দর্শনের ফলই কৃষ্ণ দর্শন—আর কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে না! বাঃ কি সুন্দর কথা"—এই কথাটিতে বৃদ্ধটি এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে এক অচেনা ব্যক্তিকে ধরিয়া দুই তিন বার এই কথাটি বলিতে লাগিলেন। সহসা বৃদ্ধটিকে দেখিলে যেন মনে হয়, তাহার মাথাটা একটু গরম হইয়াছে। তিনি রাস্তাময় পরিভ্রমণ করিয়া সকলকে এই কথাটি বলিতেছিলেন। কথাটি বৃদ্ধটির প্রাণে বড় লাগিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নির্ভীক ভাব—গিরিশবাবু কিরূপ সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি গল্প প্রদত্ত হইল। গিরিশবাবু এই গল্পটি বলিতেন।

চৈতন্যলীলার অভিনয়ে তাঁহার দেশব্যাপী সুখ্যাতি হইল। অনেক ভক্ত ও গোস্বামী, এমন কি নবদ্বীপ হইতেও অনেকে দর্শন করিতে আসেন। একদিন অভিনয় রাত্রের পর সকালবেলা নিদ্রা হইতে উঠিয়া সবে গিরিশবাবু বসিয়াছেন; এমন সময় দেখেন যে ঘরে অনেকগুলি গোস্বামী ও ভক্ত আসিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য যে তাঁহাকে কৃপা করিয়াছেন এবং নূতন পথ দেখাইয়া দিয়াছেন এইরূপ নানা কথা তাঁহারা বলিতে লাগিলেন।

গিরিশবাবু যে একজন পরম বৈষ্ণব, তাহাও তাঁহারা নির্ধারিত করিয়া দিলেন। গিরিশবাবু সমস্ত রাত্রি জগাই বা মাধাই সাজিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, তাহাতে অতিশয় ক্লান্ত রহিয়াছেন। তিনি বালিসের পার্শ্ব হইতে মদের বোতল বাহির করিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া গোস্বামী মহাশয়দিগের সম্মুখে পান করিয়া বোতল ও গ্লাসটি যথাস্থানে রাখিয়া পুনরায় চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়েরা তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে মদ খাইতে দেখিয়া কথা উল্টাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কি ও ঔষধ সেবন করিতেছেন?" গিরিশবাবু নির্ভীক লোক—স্পষ্ট বলিলেন, "খানিকটা মদ খাচ্ছি।" গিরিশবাবুর মুখে এই কথা শুনিয়া তখন বাবাজীরা পলায়ন করিলেন। সেই দেখিয়া গিরিশবাবু হাস্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি গিরিশ ঘোষ, আমি কি কাকেও ভয় করি, না চক্ষুলজ্জা রাখি!" এই উপাখ্যানটির ভিতর দিয়া গিরিশবাবুর ভিতরের ভাব অনেকখানি প্রকাশিত হয়।

গোস্বামীদিগের মতের পার্থক্য—আর একদিন নবদ্বীপ হইতে কয়েকজন গোস্বামী চৈতন্যলীলা দর্শন করিয়া পরম প্রীতি হইয়া গিরিশবাবুর বাড়িতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেই সময় বাগবাজারস্থিত কয়েকজন বৈষ্ণবও গিরিশবাবুর ঘরে উপস্থিত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গের নানা প্রকার কথা হইতে লাগিল এবং শেষে উভয়ের মধ্যে কিছু কিছু মতের পার্থক্য হইল। নবদ্বীপের গোস্বামীভক্তটি কুপিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নৃত্য করিতে করিতে কীর্তন করা বিশেষ অভ্যাস ছিল, সেইজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া বসিয়া বসিয়াই নৃত্য করিতে করিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভক্তের সহিত কলহ করিতে লাগিলেন। তিনি কীর্তনের সুর করিয়া বসিয়া বসিয়া নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিলেন, "তোর গৌরকে মানিনি, ও তোর গৌরকে মানিনি।" লোকটি এত উত্তেজিত হইয়াছিল যে, তোর গৌরকে মানিনি বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিধ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সে যাহা হউক ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে পরস্পরের যদি

কোন বিষয়ে কখন মতের পার্থক্য হইত, তাহা হইলে ব্যঙ্গ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বলিত, তোর গৌরকে মানিনি, ও তোর গৌরকে মানিনি। এইরূপ হাসি তামাসা কিছুদিন চলিয়াছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও বর্তমান লেখক—বর্তমান লেখক একবার গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বুদ্ধদেব চরিতে" পাঁঠা বলির উপাখ্যানটা কোথায় পেলেন ? আমি ত কোন পুস্তকে ঐরূপ কোন গল্প পাই নাই।" গিরিশবাবু বলিলেন, "কালী পূজার গল্পটি দেওয়াতে খুব ষ্টেজ স্যুটিং (Stage suiting) হইয়াছিল", অর্থাৎ অভিনয় খুব হৃদয়গ্রাহী হইবে সেইজন্য তিনি দিয়াছিলেন।

বর্তমান লেখক একদিন গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে প্রফুল্ল গ্রন্থে যে যোগেশের মার উন্মাদ অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে সেটি কি সেক্সপিয়রের লেডী ম্যাকবেথের অনুকরণে হইয়াছে ? প্রত্যুত্তরে গিরিশবাবু বলিলেন যে না সেটি তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর এইরূপ ব্যামো হইয়াছিল। তিনি কখন মনে করিতেন যে, যেন আট নয় বৎসরের মেয়ে, সবে বিবাহ হইয়াছে এবং শ্বাশুড়ীর নিকট ঘোমটা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছেন, কখন বা অন্য কিছু মনে করিতেছেন। এইরূপ ভাব দিনে তিন চারিবার তাঁহার হইত। বিয়েপাগলা মদন ঘোষ গিরিশবাবুদের সম্পর্কে ঠাকুরদাদা। গিরিশবাবুর পিতা ও অপর সকলে তাহার সহিত ঐরূপ তামাসা করিতেন এবং গিরিশবাবু ও অতুলবাবু প্রভৃতি মদন ঠাকুরদাদাকে বাড়িতে ঐরূপ ঠাট্টা করিতেন। গিরিশবাবুর নাটকে অনেক নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি তাঁহার জানাশুনা ব্যক্তি ছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিভা—সাধারণের ধারণা যে গিরিশবাবু শুধু অভিনয় করিতেন বা অল্প বিস্তর থিয়েটারের বই লিখতে পারিতেন, খুব পড়াশুনা বা অন্য বিষয়ে তাঁহার তেমন নৈপুণ্য ছিল না। কিন্তু গিরিশবাবুর কি সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল! কি ইংরাজী সাহিত্য, কি **Franco-Prussian War**, কি বিজ্ঞানের বিষয়, কি ঔষধের বিষয় যখন যে বিষয়ের কথা উঠিত তখন তিনি যে সে

বিষয়ে নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন শুধু তাহাই দেখাইতেন না, বরং তিনি যে সেই বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তা করিয়াছেন তাহাও দেখাইতেন এবং সেই ভাবগুলি যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইত। সাধারণ লেখকদের ভিতর এরূপ দেখা যায় না। তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ দেখিতাম যে তিনি ভাব ও ভঙ্গি হিসাবে আপনাকে পরিবর্তন করিয়া লইতে পারিতেন। অর্থাৎ যখন যে ভাব উঠিতেছে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ভাবে ভাবিত হইয়া যাইতে পারিতেন। যে রকম লোকই তাঁহার নিকট বসিয়া থাকুক না কেন তিনি ঠিক তাহাদের মত হইয়া তাহাদের মনের কথা কহিতে পারিতেন। একদিন নরেন্দ্রনাথ গিরিশবাবুকে কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, "জি. সি. সকালে তোমার কাছে আসবো কি, যত সব অহল্যা, কুন্তী, দ্রৌপদীর ব্যাপার, নানা লোকের জটলা।" গিরিশবাবু হাস্য করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ সকালে ঐ বিষয়ের কথাবার্তা হয়।" গিরিশবাবু নরেন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যে ভাবের লোকই তাঁহার নিকট আসুক না কেন তাহার সহিত তদ্‌ভাবে কথা কহিতে পারিতেন। একবার পূর্ববঙ্গের একটি লোক আসিল, তাহার কথাবার্তা অতি হীনের ন্যায়। নরেন্দ্রনাথ ও নিরঞ্জনমহারাজ তাহাকে লইয়া অনেক আমোদ করিতেন। যাহাকে তিনি বেল্লিক বাজারে 'দোকড়ি সেন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপ নীচ লোকের সহিতও গিরিশবাবু হুবহু তাহাই হইয়া থাকিতেন আবার যোগেন মহারাজ প্রভৃতির সহিত ভক্ত হইতেন। মোট কথা যাঁহারা গিরিশবাবুকে একটি দিক দিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ভুল বুঝিয়াছেন। দশ বারটা গিরিশ ঘোষ একটা দেহের ভিতর বাস করিতেন, কিন্তু প্রকৃত গিরিশবাবু নিতান্ত সাদাসিদে বালকস্বভাব ও ভক্তি পরায়ণ লোক ছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের মেধা—মেধা ও স্মরণ-শক্তি গিরিশবাবুর অদ্ভুত ছিল। তাঁহার কারণ দেখিতাম যে যখন তিনি যে বিষয়টি দেখিতেন —কি উড়ের যাত্রা, কি মুদির দোকান, কি বেড়ালের ঝগড়া সেই

বিষয়ে তিনি একেবারে আত্মহারা হইয়া দৃষ্ট বস্তুতে ডুবিয়া যাইতেন। দুই মিনিট পূর্বে যিনি হাস্য কৌতুক করিতেছিলেন পর মুহূর্তে তিনি দৃষ্টবস্তুতে আত্মহারা হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন। তখন পার্শ্বে কি ঘটনা হইতেছে তিনি শুনিতে পাইতেন না।—যেন জগৎ সংসার ভুলিয়া গিয়া সেই বিষয়ে ডুবিয়া গিয়াছেন। কোন জিনিস তাঁহার নিকট তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের বিষয় ছিল না। সবই শিখিবার জিনিস।

বর্তমান লেখক বৈকালে গিরিশবাবুর বাড়িতে চা পান করিতে যাইতেন এবং সেই উপলক্ষে নানাবিধ প্রসঙ্গ আলোচিত হইত। ঘটনাক্রমে বহু বছর পরে একটা কথা উত্থাপন হয়। বর্তমান লেখক গিরিশবাবুর বাড়িতে বহু বৎসর পূর্বে চা খাইতে খাইতে কি কি কথা বলিয়াছিলেন গিরিশবাবু সেইদিন সকল বিষয় হুবহু বলিয়া দিলেন এবং কথাগুলি সমস্ত ঠিক হইয়াছিল। গিরিশবাবুর স্মরণ শক্তি অসাধারণ ছিল। একবার বায়রণের (Byron) লেখার কথা উঠিল। গিরিশবাবু বায়রণ হইতে জলের মত আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন। সেক্সপীয়রের কাব্যের উপর তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং তিনি বিশেষ বিশেষ ভাবে সেক্সপিয়রের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। কলেজের মাষ্টারেরা যে সকল স্থান ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিত না, গিরিশবাবু সেইগুলি জলের মত বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। বর্তমান লেখক গিরিশবাবুর অনেক জায়গার ব্যাখ্যা শুনিয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের দুঃখ—তিনি একসময় আক্ষেপ করিয়া একটি কথা বলিয়াছিলেন, "আমার অবস্থা হয়েছে কি জান? প্রকাণ্ড বড় মাথা একটুখানি শরীর; অর্থাৎ জিনিসটা বোঝাবার শক্তি খুব আছে, বিচার, তর্ক ও ভাবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার শক্তিও খুব আছে, কিন্তু সেইটি উপলব্ধি করিয়া জীবনে প্রতিফলিত করিবার ক্ষমতা নাই। এই জন্যই দুঃখটা অধিক হইয়া থাকে যে বুঝতে পারলুম, করতে পারলুম না।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি

অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। পরক্ষণে আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা তুলিয়া বলিলেন, "করতে পারি আর না পারি, বুঝতে পারি আর না পারি তাঁকে ধরে পড়ে আছি, আমার আর কোন ভাবনা চিন্তার আবশ্যক নাই, তিনি আমার সব, তিনি আমার সব করিয়া লইবেন।" মস্তিষ্ক বিকাশ হিসাবে যদি রামকৃষ্ণসঙ্ঘের ভিতর নরেন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে, তাহা হইলে গিরিশবাবু বুদ্ধি প্রাখর্যে ও পাণ্ডিত্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সাধনার হিসাবে অবশ্য অনেকে তাঁহার চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সে কথা লইয়া বিচার করিতেছি না। তবে তাঁহার যে সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল তাহাই প্রকাশ করা এখানে উদ্দেশ্য। তাঁহার একটি বিশেষ গুণ ছিল যে তিনি অকপট ও নির্ভীক ছিলেন। জগৎকে তিনি তৃণজ্ঞান করিতেন এবং জগতে ভাল মন্দ যা তিনি করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি নিজে দায়ী, অপর কাহারও উপর দোষ দিতেন না।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের অসুখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে নিবেদন—১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশবাবুর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষের (দানীবাবু) বিশেষ অসুখ হয়। গিরিশবাবুর একমাত্র পুত্র তাই তিনি বড় চঞ্চল হইয়া পড়িলেন ঔষধাদির যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয় তাহা সমস্তই হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত সকলকে গিরিশবাবু বলিতে লাগিলেন, "দেখ, দানীর অসুখের জন্য ঔষধ পত্র যা করবার সব করেছি। আজ দুপুর বেলায় আর এক কাজ করেছি। বাড়ির ভিতর গিয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকলুম, তখন কেউ ছিল না একটা ত প্রণাম করে দাঁড়িয়ে উঠে সব অসুখের কথা তাঁকে বললুম। আর বললুম যে আমার একমাত্র ছেলে তুমি ভাল করে দাও। তারপর মুখে যা এলো সব বলে গাল পাড়তে সুরু করলুম। তাঁর চৌদ্দ পুরুষের অন্ত করে এলুম। তখন রেগে গিয়েছিলুম মুখে যা এলো তাই বললুম—বললুম যে তুই যদি অবতার হোস্ তো আমার ছেলেকে ভাল করে দে, তা না হলে মুখ খারাপ করে গাল দেবো। এখন দেখ আমার ছেলে নিশ্চয় ভাল হবে", এই বলিয়া গিরিশবাবু হোঃ হোঃ

করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কথাগুলি যাহা হউক না কেন কিন্তু গিরিশবাবু এমন নিষ্ঠা ও নির্ভরের ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এই সকল কথা ও কার্য শুধু গিরিশবাবুর পক্ষে সম্ভব অপর কেহ যেন তাঁহাকে অনুকরণ না করে। প্রকৃতই গিরিশবাবুর পুত্র দানী বাবুর অসুখ সেবারে ভাল হয়ে গেল।

নিরঞ্জনানন্দ স্বামী ও হাতকাটা বাবাজী—নিরঞ্জনমহারাজ ও বর্তমান লেখক একদিন প্রাতে কাশীপুরের 'হাতকাটা' বাবাজীর নিকট যান। কাশীপুরের গঙ্গার ঘাটে হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব সাধু-মহাত্মা একটি আশ্রম করিয়াছিলেন এবং অনেক বৈষ্ণব সাধুকে তিনি আহার দিতেন। তিনি নানা প্রকার ঔষধ জানিতেন। এইজন্য তাঁহার বেশ অর্থাগম হইত। যাহা হউক তিনি একবার গিরিশবাবুর 'বুদ্ধদেব চরিত' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। সাধুটি নিরঞ্জন-মহারাজকে বলিলেন, "আচ্ছা যিনি এরূপ বৈরাগ্যপূর্ণ কথা লিখিতে পারেন—

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই,
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর।
অধীর অধীর যেমতি সমীর,
অবিরাম গতি নিয়ত ধাই॥

যাঁহার বৈরাগ্য পূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া সাধুরও প্রধুমিত বৈরাগ্য প্রজ্বলিত হইয়া উঠে তিনি কি করিয়া গৃহস্থ আশ্রমে থাকেন এই কথাই বোঝা যাচ্ছে না।" হাতকাটা বাবাজী অনবরত এই কথা নিয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। নিরঞ্জন মহারাজ তাঁহাকে

গিরিশবাবুর কথা অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু হিন্দুস্থানী সাধুটি গিরিশবাবু কি করে গৃহস্থ আশ্রমে আছেন এই কথাই অনবরত বলিতে লাগিলেন। তাহারপর কিছু কথাবার্তা কহিয়া দুইজনায় পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।

বুদ্ধদেব চরিতের বিখ্যাত সঙ্গীত—গিরিশবাবুর বুদ্ধদেব চরিত হইতে—

জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই, সদা ভাবি গো তাই॥
কে খেলায় আমি খেলি বা কেন,
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন।
এ কেমন ঘোর, হবে নাকি ভোর,
অধীর অধীর যেমতি সমীর
অবিরামগতি নিয়ত ধাই॥
জানি না কেবা এসেছি কোথায়,
কেন বা এসেছি কোথা নিয়ে যায়,
যাই ভেসে ভেসে কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল উঠে নানা রোল।
কত আসে যায় হাসে কাঁদে গায়
এই আছে আর তখনি নাই॥
কি কাজে এসেছি কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন, কি খেলা হল।
প্রবাহের বারি রহিতে কি পারি,
যাই যাই কোথা কূল কি নাই॥
করহ চেতন কে আছ চেতন,
কত দিনে আর ভাঙ্গিবে স্বপন॥
কে আছ চেতন ঘুমায়ো না আর,

দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার ॥
কর তমোনাশ হও হে প্রকাশ,
তোমা বিনে আর নাহিক উপায়
তব পদে তাই শরণ চাই ॥

নরেন্দ্র যখন এই গানটি গভীর রাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া সিমলার গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটস্থ বাড়ির দালানে আপনার মনে পায়চারি করিতে করিতে গাহিতেন তখন তাঁহার মুখ হইতে গানটি এমন শ্রুতিমধুর হইত যে বাড়ির আশে পাশের ঘরের নিদ্রিত ব্যক্তিরা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া স্থির হইয়া শুনিতেন। সুর, তাল, রাগের কথা নহে কিন্তু ভিতরের প্রাণ থেকে ঠিক নিজের অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া তিনি জীবন্ত ভাবে গানটি গাহিতেন। যাঁহারা নরেন্দ্রনাথের মুখে রাত্রিতে সেই গান শুনিতেন তাঁহাদের তখন আর বাহ্য জ্ঞান কিছু থাকিত না—সংসারের মায়া মমতা ভুলিয়া গিয়া কোথায় এক অসীম জগতে প্রবেশ করিতেন। এই গানটি বরাহনগর মঠে সর্বদাই গীত হইত।

নরেন্দ্রনাথের উদ্‌ভ্রান্ত ভাব—নরেন্দ্রনাথ যখন বুদ্ধদেব চরিতের গান গাহিতেন সেই কয় মাস তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মন হইয়াছিল তাঁহার বাহ্যিক জ্ঞান অনেক সময় থাকিত না। নিজে যেন শরীরটা পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক জগতে বসিয়া আছেন। তখন তিনি কাছা দিয়া কাপড় পরিতেন। অভ্যাস হিসাবে কখনও কাছাটা গুঁজিয়াছেন, কখনও বা বাঁদিকের কসির কোমরের দিকে কখন বা সম্মুখের দিকে, কখন বা উলঙ্গ প্রায় হইয়াই চলিয়া বেড়াইতেছেন—কিছুই যেন স্মরণ নাই। কখন কখন বা বসিয়া নিজের মনে কি বকিতেছেন, কখন বা হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সদা সর্বদাই প্রায় বিভোর অবস্থায় থাকিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার এইরূপ বিভোর ভাবটা সর্বদাই ছিল সেইজন্য তাঁহার সঙ্গীরা অনেক সময় 'পাগলা বিলে' বলিত। গঙ্গাধরমহারাজ বলিয়াছিলেন যে, একবার দুইজনে মিলিয়া একত্রে পাহাড়ে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে একটা সড়ক বা পাকদণ্ডীর পথ আসিল। স্বামীজী

পাক্‌দণ্ডির পথ দিয়া উঠিয়া একটা জায়গায় দাঁড়াইলেন। গঙ্গাধর মহারাজ নীচে হইতে দেখিতে লাগিলেন যে নরেন্দ্রনাথ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন কোন কথাবার্তা নাই, তাহার পর কাহার সহিত যেন কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন, কি বিড়বিড় করিয়া বকিতে লাগিলেন, তাহার পর হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর একটু পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার তিনি সমস্ত ভাব সম্বরণ করিয়া গম্ভীর মুখ করিয়া চলিতে লাগিলেন। সেই সময় নরেন্দ্রনাথেব এরূপ ভাব কয়েকমাস ছিল।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীর ফুল তুলিতে যাওয়া—আলমবাজার মঠে থাকা কালীন শশীমহারাজ দক্ষিণেশ্বরেব দিকে একটা বাগানে ফুল তুলিতে যাইতেন বাবুরাম মহারাজ ও বর্তমান লেখককে সঙ্গে লইয়া সেইদিকে ফুল তুলিতে দুই একবার গিযাছিলেন অর্থাৎ সঙ্গে একজন থাকিলে দুইচারিটি কথাবার্তাও হইবে এবং সকালে একটু বেড়ানও হইবে এইজন্য শশীমহারাজ এরূপ কোন একটি বাগানে ফুল তুলিতে যাইতেন। একদিন সেই বাগানের মালী ক্রুদ্ধ হইয়া ফুল তোলা নিবারণ করিবার জন্য শশীমহারাজকে ধাক্কা মারিয়াছিল। শশীমহারাজ তখন নিতান্ত নিরাশ্রয়, তাহারপর প্রত্যহ ফুলই বা কোথায় পাইবেন, আবার কিনিবার পয়সাও নাই সেই জন্য অপমানটা সহ্য করিয়া রহিলেন। কিন্তু প্রাণে তাঁহার বড্ড লাগিয়াছিল যে, দুটো ফুলের জন্য একটা মালীর নিকট ধাক্কা খাইলেন। এইজন্য মনে মনে শশীমহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বলিয়াছিলেন যে যদি একটু জায়গা হয় তাহলে সেখানে দুটো ফুল গাছ পুঁতিয়া তাহার ফুল দিয়া তাঁহার পূজা দিবেন। শশীমহারাজ মঠে ফিরিয়া আসিয়া সকলকে মালীর বিষয় বলিলেন এবং তাহাতে সকলের প্রাণে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। বরাহনগর মঠ ও আলমবাজার মঠের প্রথম অবস্থায় এই রকমভাবে দিন কাটিয়াছিল।

আলমবাজার মঠে বসন্তের মাতার আগমন—আলমবাজার মঠে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন রবিবারে বেলা বারটার সময়

রাস্তায় একখানি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটি যুবক আসিয়া শিবানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া লইয়া গেল। বরাহনগরের মঠে প্রথম অবস্থায় গুপ্ত মহারাজের সমসাময়িক বসন্ত নামে একটি যুবক এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছিল। কয়েক মাস মঠে থাকিয়া যুবকটি কোথায় চলিয়া যায়, তাহার পরে আর কোন খবর ছিল না। প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর পরে বসন্তের মাতা একখানি গাড়ি করিয়া আসিয়া শিবানন্দ স্বামীর সহিত দেখা করিয়া তাহার নিরুদ্দেশ পুত্রের বিষয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পুত্র শোকে বসন্তের মাতার একটু উন্মত্ত অবস্থা হইয়াছিল এবং অনবরত পুত্রের জন্য শোক ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া শিবানন্দ স্বামী বড় ব্যথিত ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে সাধ্যমত সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া জপ ধ্যান ও ঈশ্বরে মন দিতে বলিলেন কিন্তু পুত্র শোকাতুরা মাতা অনবরত পুত্রের কথা কহিতে লাগিলেন। এমন কাতর ও করুণস্বরে কথা কহিলেন যে শিবানন্দ স্বামীও অতি ম্লান ও বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন কারণ বসন্তের আসার তখনও কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও জনৈক সাধুর চিংড়ি মাছ খাইয়া আনন্দ— আলমবাজারের মঠে বর্ষার সময় শশীমহারাজ মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে ফুল তুলিতে যাইতেন। নহবৎখানায় একজন সাধু কয়েক দিবস বাস করিতেছিলেন। তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী—মূর্তি বিগ্রহ কিছুই মানিতেন না। সাধুটি সদানন্দ পুরুষ এবং বেশ পণ্ডিত। শশীমহারাজকে গৈরিক বসন পরিয়া ফুল তুলিতে দেখিয়া তিনি শশীমহারাজের সহিত কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন এবং সন্ন্যাসী হইয়া পূজা পাঠ করে সেইজন্য নানা প্রকার তর্ক-বিতর্ক করিতে লাগিলেন কালীবাড়িতে তাঁহাকে ভাত খাইতে হইত তাহাতে অনভ্যস্থ সেইজন্য তাঁহার একটু কষ্টও হইয়াছিল কারণ তাঁহার রুটি খাওয়া অভ্যাস ছিল। শশীমহারাজ একদিন তাঁহাকে আলমবাজারের মঠে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। সাধুটির

চেহারা গৌরবর্ণ ও সুশ্রী, বয়স চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ হইবে, খুব ত্যাগী এবং সর্বদাই প্রফুল্ল। কথাবার্তায় তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী এবং কিছুই মানিতেন না। তাঁহার সহিত কথাবার্তায় বুঝা যাইল যে তাঁহার জন্মস্থান ছিল কাশ্মীরে জম্মু বিভাগে। তাঁহাকে রুটি ও বিলাতি কুমড়ো, কুঁচো চিংড়ী ও বড়ি দিয়া একটা অম্বল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সাধু একবার করিয়া সেই অম্বল দিয়া রুটি খায় আর মহাআনন্দ করিয়া চিৎকারধ্বনি করে, "কি উত্তম জিনিস, বাঙ্গালা দেশে কি উত্তম জিনিস হ্যায়।" তাঁহার আনন্দধ্বনিতে সকলে বিশেষ হর্ষিত হইয়া উঠিল। অবশেষে সাধুটি একটি চিংড়ি মাছ লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি ফল? একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "ঐ সম্মুখে যে নারকেল গাছ দেখছেন এ তাব ফল"। সাধুটি আরও হর্ষিত হইয়া বলিলেন, "ধন্য বাঙ্গালা দেশ, ধন্য নারিকেল গাছ যেখানে এমন সুন্দর ফল হয়।" আহারান্তে তিনি অনবরত সেই ফলের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে চলিয়া যাইলেন।

স্বামী সোমানন্দ—একজন মাদ্রাজী যুবক অনেক অনুসন্ধান করিয়া দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে আসিয়া রহিলেন। কলেজের পড়া ছেলে, গেরুয়া ছুপাইয়া বাড়ি হইতে আসিয়াছে; ইংরাজী ব্যতীত বাঙ্গালা বা হিন্দী কিছুই জানে না। কালীবাড়িতে থাকে ও নিজের মনে জপ-ধ্যান করে। শশীমহারাজ ফুল তুলিতে গিয়া যুবকটিকে দেখিলেন এবং তাহার সহিত ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিয়া তাহাকে আলমবাজার মঠে আসিতে বলিলেন। যুবকটি নিজের নামের পরিচয় দিল যে সে সোমসূর্য ভারতী, মাদ্রাজ দেশে তাহার বাড়ি। সে স্বামীজীর বক্তৃতা সংবাদপত্রে পড়িয়া একেবারে মোহিত হইয়া গৃহাদি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কোথায় যাইবে, কাহার সহিত আলাপ করিবে তাহা কিছুই জানিত না। শশী মহারাজ তাহাকে অন্যত্র থাকিতে নিষেধ করিয়া আলমবাজার মঠে থাকিতে অনুমতি দিলেন। তদবধি সে রহিয়া গেল এবং স্বামীজী

প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহার নিকট সন্ন্যাস লইয়া সোমানন্দ নামে পরিচিত হইলেন। সোমানন্দ প্রথমে এইরূপে আসিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তিনি বাঙ্গালোরে আছেন ও অনেক কার্য করিয়া থাকেন।

আলমবাজার মঠে নিরঞ্জনমহারাজ ও কালীবেদান্তী প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় অনেক ঘটনা একখানি খাতায় লিখিয়াছিলেন এবং হরমোহন মিত্রকে দিয়া সেই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার কথা হইয়াছিল। সেই গ্রন্থখানিতে প্রথম ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ হয় কিন্তু সেখানির পরে কি হইল বর্তমান লেখকের আর বিশেষ জানা নাই।

আলমবাজার মঠের মাঝামাঝি সময় নিরঞ্জনমহারাজ মাদ্রাজ ও সিংহল দ্বীপে যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া তিনি দক্ষিণ দেশে, মাদ্রাজে ও সিংহলে গিয়া কিছুদিন ছিলেন এবং ছয় সাত মাসের ভিতর পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। তথায় একটি কেন্দ্র স্থাপন বা মঠ বা কোন প্রকার স্থান প্রতিষ্ঠা করার ভাব তখন তাঁহার মনে ছিল না। সেইজন্য তিনি দর্শনমাত্র করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন এবং তত্রস্থ লোকদিগের সহিত কিছু পরিমাণে আলাপ পরিচয়ও করিয়াছিলেন।

হুট্‌কো গোপাল নরেন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। নরেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ বা ইংরাজী ধর্মগ্রন্থ হইতে যে সকল উক্তিগুলি সদাসর্বদা আওড়াইতেন হুটকো গোপাল সেইগুলি কাগজের উপর বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া পেষ্টবোর্ডে মারিয়া দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। উক্তিগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। হুটকো গোপাল নিবিষ্ট মনে এইগুলি লিখিতেন ও নরেন্দ্রনাথের স্মৃতি মনে করিতেন।

মাদ্রাজ হইতে স্বামীজীর পত্র লেখা—নরেন্দ্রনাথ যখন মহাবৈরাগ্য ভাবে মাদ্রাজে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ঘটনাক্রমে তিনি খবর পাইলেন যে বর্তমান লেখকের মুখ দিয়া রক্ত উঠিতেছে। তিনি ইহা শুনিয়া একেবারে বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। সংসারে অতিশয় কষ্ট সেইজন্য এইসব হইয়াছে এই চিন্তায় তিনি আন্তরিক অতিশয় ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। যদিও বাহ্যিক কিছু প্রকাশ করিলেন না

কিন্তু অন্তরে বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। লণ্ডনে অবস্থান কালে একদিন তিনি এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। মাদ্রাজ হইতে সান্ন্যাল মহাশয় বা শরৎমহারাজকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন ; তাহাতে কাতর হইয়া স্বীয় মাতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "আমি অতি অকৃতী সন্তান, মাতার কিছু করিতে পারিলাম না, কোথায় তাহাদের ভাসিয়ে দিয়ে চলিয়া আসিলাম।" বৃদ্ধ মাতার কি হইবে ইত্যাদি অনেক কথা করুণস্বরে যেন স্বীয় মাতার নিকট ক্ষমা চাহিতেছেন এইরূপ ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন। যাহা হউক তাঁহার এইরূপ ভাব-গতিক দেখিয়া খেতড়ির রাজা বরাবর স্বামীজীর মাতার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন।

স্বামীজী ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ—স্বামীজী আমেরিকায় গিয়াছেন যদিও এই খবরটি শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী, সান্ন্যাল মহাশয়, শরৎমহারাজ ও বর্তমান লেখক ব্যতীত আর কেহ জানিত না কিন্তু পরে অল্প বিস্তর সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। আমেরিকায় যাইয়া কৃতকার্য হইতে পারিবেন কি না এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়া স্বামীজী সান্ন্যাল মহাশয় ও শরৎমহারাজকে লিখিয়াছিলেন যে এ কথা যেন প্রকাশ না পায়। কারণ আমেরিকায় ভাব গতিক অন্য প্রকার। ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতে হইবে এবং কি যে হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহার পর ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করা তাঁহার মোটেই আভ্যাস ছিল না এবং মাদ্রাজ ব্যতীত কোথাও তিনি প্রায় ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিতেন না। এইজন্য তাঁহার মনে সন্দেহ ছিল। কথাটি যখন প্রকাশ পাইল তখন কেহ কেহ প্রশ্ন তুলিলেন যে সেখানে ইংরাজীতে কথা কহিতে হয় ও ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে হয়, স্বামীজী তো এ সব কিছু জানেন না তবে যাইয়া কি করিবেন? কেহ কেহ আপত্তি তুলিলেন যে সেখানে অপরের সাথে আহার করিতে হইবে সাধু বা হিন্দুর পক্ষে কি করিয়া সম্ভব? কেহ কেহ বলিলেন হিন্দুর পক্ষে সমুদ্র যাত্রা তো নিষেধ তবে স্বামীজী কি করিয়া যাইতে পারেন? একজনের এক ভীষণ আপত্তি উঠিল এবং তিনি

মীমাংসা করিতে না পারিয়া ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "আমেরিকা ঠাণ্ডা দেশ, সাহেবদের দেশ, সেখানে ইজের পরিতে হয়, স্বামীজী গেরুয়া পরেন তিনি কি করিয়া ইজের পরিবেন এবং গেরুয়া কাপড় পরিত্যাগ করিয়া অন্য রঙের কাপড় কি করিয়া পরিবেন ?" এক্ষণে যদিও এ কথাগুলি হাস্যোদ্দীপক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া সকলের বোধ হইতেছে কিন্তু তখনকার কলিকাতার সমাজে এই সকল কথা অতি ভীষণ বলিয়া বোধ হইতেছিল। তখনকার সমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল এই সকল কথাতে তাহা স্পষ্ট জানিতে পাওয়া যায়।

বিবিদিষানন্দ—১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসে ইংরাজী কাগজে মারউইন মেরী স্নেল নামক জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত একখানি পত্র স্বামী বিবেকানন্দ নাম দিয়া লিখিলেন। অনেকেরই ধারণা হইল যে লোকটি মাদ্রাজী হইতে পারে কারণ তখন বহুবাজারে অনেক মাদ্রাজী অর্শের ডাক্তার থাকিত এবং তাহাদের নামে স্বামী শব্দ থাকিত। এমনকি আলমবাজার মঠে অনেকে জানিতেন না যে স্বামীজীর সন্ন্যাস নাম বিবেকানন্দ। কারণ কথিত আছে স্বামীজীকে একমাস বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ বা অপর একটি নাম গ্রহণ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তিনি আত্মগোপন করিবার জন্য, জগৎ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবার জন্য কোন নাম বা উপাধি রাখিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। এই জন্য তাঁহার নাম কি ছিল তখন বিশেষ কেহ জানিত না। কিন্তু প্রতিভা এমন জিনিস যে নাম পরিবর্তন করিলেও ব্যক্তি নির্ণয়ের কোন কষ্টই হয় না।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—কার্তিক মাসে একদিন প্রাতে মাষ্টার মহাশয় একখানি 'Statesman' হাতে লইয়া রামতনু বসুর গলির বাড়িতে যাইয়া আহ্লাদ করিয়া সেই পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ লোকটি কে তাহা বিশেষ ভাবে স্থির করিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহাকে সমস্ত কথা বলা হইল তখন তিনি বিশেষ আহ্লাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চিকাগোয় ধর্ম মহাসভা হইয়াছে তাহার খবর জানিবার জন্য সকল সংবাদপত্র বিশেষ উৎসুক ছিল এবং যে যে বিষয়ে যাহা কিছু খবর পাইতেন তাহা বড় করিয়া প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে স্বামীজীর দুটি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা কার্যগতিকে কলিকাতায় আসিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইল। প্রথম অভিভাষণ বক্তৃতাটি এবং তৎসংক্রান্ত শ্রোতৃবর্গের উপর কিরূপ আকস্মিক প্রভাব হইয়াছিল তাহাই বর্ণিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়টি বেদান্তর উপর ছিল, এই দুইটি প্রথমে প্রকাশিত হয়।

জনৈক গুরুভাই-এর স্বামীজীর বক্তৃতা লইয়া ব্যঙ্গ করা—স্বামীজীর চিকাগোর সংবাদ প্রকাশে আলমবাজার মঠে মহা গণ্ডগোল উঠিল। বলরামবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যার সময় যখন বক্তৃতাটি একজন পড়িতে লাগিলেন এবং অপর সকলে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন, তখন জন কয়েক ব্যক্তি বিশেষতঃ তাহার ভিতর একজন হস্ত প্রসারণ করিয়া নানা ভাব-ভঙ্গি করিয়া অতি বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। নানা রকম করিয়া মাথা ঘুরাইয়া বক্তৃতা হইতে একটু একটু উদ্ধৃত করিয়া অবজ্ঞা করিয়া নানা প্রকার ব্যঙ্গ ও কুৎসা করিতে লাগিলেন। মোট কথা তখন বক্তৃতাটি অনেকেই বুঝিতে পারিলেন না ; কেহ বা নীরব হইয়া রহিলেন। এবং জন কতক কেবল বিশেষ ব্যঙ্গ ও কুৎসা করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর বিপক্ষে প্রেমানন্দ স্বামীর কুৎসা প্রচার করা—আলমবাজার মঠে জনৈক গুরুভাই বিদ্বেষী দল তৈয়ারি করিতে লাগিলেন। তিনি হরমোহন মিত্র আর জন কয়েক ভক্তকে জুটাইয়া একটি দল করিলেন তাহাদের কার্য ও উদ্দেশ্য স্বামীজীর নিন্দা ও কুৎসা করা। বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন "নরেনটা অহংকারে ফুলে উঠেছে, নিজের নাম জাহির কচ্ছে, নিজে নাম কিনবার জন্য মহা ছড়াছড়ি, চেলা করে নিজে এক বড় লোক মহান্ত হবে। ওটা অহংকারে মট্ মট্ করে, এমনি অহংকার যে তার বক্তৃতায় তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) নামটা পর্যন্ত উল্লেখ করল না—শুধু নিজেরই

নাম জাহির কচ্ছেন। আর প্রথম থেকেই জানা আছে ওটা তাঁকে কখনই মানতো না। মুখের ওপর তর্ক ও জবাব করতো। কেবল নিজের নাম জাহির করা আর নিজের মত প্রচার করা এইটাই হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এই যে তার ভাইটা বসে আছে। আর যে সব কথা বক্তৃতায় বলেছে এ সব কথা তাঁর (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কোনই ভাব নয়। তাঁর এ ভাবের সঙ্গে কোনই মিল নাই। এ একটা স্বতন্ত্রভাব নরেনটা প্রচার করে বেড়াচ্ছে।" বাবুরাম মহারাজের এই সময় কিরূপ একটা বিপরীত বিদ্বেষ ভাব আসিয়াছিল। যদিও তিনি স্বভাবে অতি ধীর ও বিনয়ী ছিলেন কিন্তু এই সময় তিনি যেন ভূতগ্রস্ত হইয়াছিলেন। আলমবাজার মঠে এবং কলিকাতায় আসিয়া তিনি সকল ভক্তের বাড়ি যাইয়া কুৎসা, নিন্দা ও গালি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হরমোহন মিত্র এবং আর দুই চারটি তাঁহার সহচর হইল। এই সময় বাবুরাম মহারাজ আহার করিতে হয় তাই আহার করিতেন নচেৎ অন্য সব সময় কেবল স্বামীজীর বিপক্ষে কুৎসা করিয়া বেড়াইতেন। মানুষ ভূতগ্রস্ত হইলে যত রকম নিন্দা করিতে পারে বাবুরাম মহারাজ অনবরত সেইরূপ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের নিন্দা ও কুৎসা করা তাঁহার যেন একটি সাধনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। রাত্রে তাঁহার নিদ্রা হইত কিনা সন্দেহের বিষয়। বাবুরাম মহারাজের ব্যাপার দেখিয়া গিরিশবাবু একদিন বলিলেন, "বাবুরাম কচ্ছে কি ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

কিন্তু বাবুরাম মহারাজের গাল মন্দতে উল্টো ফল হইল। শরৎমহারাজ, কালীবেদান্তী ও সান্ন্যাল মহাশয় মহা বিরক্ত হইয়া বাবুরাম মহারাজের উপর চটিয়া যাইলেন এবং মাঝে মাঝে বাবুরাম মহারাজকে ধমকাইতে লাগিলেন। হরিমহারাজ অতি ধীর, এবং নরেন্দ্রনাথের মহা অনুগত, তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন যে বেদান্তের মত এইরূপই, বেদান্তে এ সকল কথা আছে। কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে!

প্রেমানন্দ স্বামীকে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর ব্যঙ্গ করা—বাবুরাম মহারাজ গাল পাড়িয়া যখন ক্লান্ত হইয়া একটু চুপ করিয়া থাকিতেন তখন রাখালমহারাজ উস্‌কাইয়া দিবার জন্য তাহাকে বলিতেন, "ও বাবুরাম, শুনেছ আর এক খবর কি এসেছে? নরেন সেখানকার মেয়েদের সঙ্গে তো খাচ্ছেই আবার সে কি বলেছে জান? খুব টাকাওয়ালা একটা বড় মানুষ মেমকে বে করে সেখানে সে বাস করবে আর এ দেশে সে আসবে না, তোমাদের সঙ্গে আর সে দেখা করবে না।" এই কথা শুনিয়া বাবুরাম মহারাজ আবার ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিতেন, "হ্যাঁ, তা সে সব করতে পারে তার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তাঁকেই (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) যখন মানে না তখন সেটার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই। সে মেম বিয়ে করুক গে আর যা করুক গে, তার কথা তোলবার আর দরকার নাই।" আবার রাখালমহারাজ চিপটিনি কাটিয়া ঐরূপ আর একটা কথা তুলিয়া দিতেন। আবার বাবুরাম মহারাজ হাত পা মাথা নাড়িয়া পাগলের ন্যায় অজস্র গালি পাড়িতেন। কিন্তু গালের ভাণ্ডার শীঘ্রই ফুরাইয়া যাইত তাই এক কথাই বারে বারে কেবল আওড়াইতে লাগিতেন, তাহাতে রাখালমহারাজ হাসিতেন ও চিপ্‌টিনি কাটিয়া কথা কহিতেন। গুপ্তমহারাজ স্বামীজীর শিষ্য, এইরূপ নানা প্রকার কুৎসা শুনিয়া রাগিয়া উঠিলেন, এবং রাখাল-মহারাজও ক্রুদ্ধ হইয়া দুই একটি তীব্র কথা বলিতে লাগিলেন। শরৎমহারাজ, সান্যাল মহাশয় ও কালীবেদান্তী এই তিনজনে ক্রমে গরম হইয়া উঠিয়া বাবুরাম মহারাজের অযথা গালিগালাজ সহ্য করিতে না পারিয়া মাঝে মাঝে ধমক দিতে সুরু করিলেন। কলিকাতার ভক্তদিগের মধ্যে যাহারা বাবুরামমহারাজের দলের ভিতর ছিল তাঁহারাও নরম ভাবে নরেন্দ্রনাথের বিপক্ষে কথা বলিতে লাগিলেন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতের সহিত যে নরেন্দ্রনাথের মতের মিল নাই তাহাই বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রেমানন্দ স্বামীর প্যামফ্লেট ছাপান—বাবুরাম মহারাজ,

হরমোহন মিত্র ও আর জন কয়েক মিলিয়া এক প্যামফ্লেট বা পুস্তিকা ছাপাইলেন। সেই প্যামফ্লেটের নীচেটা হইল স্বামী বিবেকানন্দ (ছোট ছোট অক্ষরে) আর উপরটা Disciple of Lord Ramakrishna (বড় বড় অক্ষরে)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মানে না, সে তাহার নিজের এক মত প্রণয়ন করিয়াছে। এক্ষণে নিজের নাম জাহির হইয়াছে বলিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গুরু বলিয়া মানে না সেইজন্য সে যে Lord Ramakrishna Paramahansaর শিষ্য সেই কথা সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। এই প্যামফ্লেট খানি বিডন উদ্যান ও অপর স্থলে বিতরণ করা হইতে লাগিল। কালীবেদান্তী প্যামফ্লেটখানি দেখিয়া বাবুরাম মহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "কি বাবুরাম নরেন বুঝি দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তাই বুঝি টেনে বুনে খোঁটায় এনে বাঁধছ !" বাবুরাম মহারাজের এরূপ কার্য কলাপ দেখিয়া কালীবেদান্তী বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন কারণ ক্রমশঃ তাঁহার ব্যবহার সকলের অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল।

আলমবাজার মঠে স্বামীজীর পত্র প্রেরণ—গরমিকাল, রবিবার সকলের আহার হইয়াছে এবং বড় ঘরটিতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন। শরৎমহারাজ ও হরিমহারাজ পূর্বদিকের দেওয়ালের নিকট শুইয়া কি পড়িতেছিলেন। রাখালমহারাজ তাহার পরের একটি স্থানে বসিয়াছিলেন এবং কালীবেদান্তী ও বর্তমান লেখক পশ্চিমদিকের প্রথম ও দ্বিতীয় দরজার মধ্য-দেওয়ালটির কাছে একটি বালিশে মাথা দিয়া শুইয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ আহারান্তে কোঁচার কাপড়খানি গায়ে দিয়ে ঘরের মাঝখানে আসিয়া বসিলেন এবং খোড়কে লইয়া দাঁত খুটিতে লাগিলেন ও মাঝে মাঝে থুথু ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার খাইবার সময় গাল দেওয়া বন্ধ হইয়াছিল, সময়টা অপব্যয় হইয়াছে তাই দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় গাল মন্দ আরম্ভ করিলেন কিন্তু কথা সেই পুরাতন, কাহারও শুনিতে আর ভাল লাগিতেছিল না। তবে মাথা গরম বাবুরামমহারাজ

নিজের মনে এক ঘেয়ে গাল দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় ডাক-পিয়ন আন্দাজ বারটার সময় আমেরিকা হইতে প্রেরিত শশী মহারাজের নামে দুইখানি পত্র দিয়া যাইল। বহুদিনের পর এইবার মঠে প্রথম পত্র আসিল। পত্র দুইখানিতে লেখা ছিল, "সকলকে আমার বিশেষ সাদর সম্ভাষণ দিবে। আমায় আমেরিকায় আসিয়া অনবরত কার্য করিতে-হইতেছে। ভিক্ষা করা এ দেশে চলে না এবং এ প্রথাও এখানে নাই এজন্য বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে হয় তাহাতে পেটের অন্ন জোটে। রাখালমহারাজকে বিশেষ করিয়া আমার দণ্ডবৎ, লাঠিবৎ, ছাতিবৎ সব দিও" ইত্যাদি। খুব অমায়িকভাবে পত্রখানি লেখা ছিল এবং নীচে নরেন্দ্রনাথের নাম সহি ছিল।

দ্বিতীয় পত্র খানিতে এই ভাবে লেখা ছিল, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নাম করা হয় নাই বলে কেহই যেন মনে মনে উদ্বিগ্ন না হয়। তাঁহার নাম এখানে প্রথম করিতে গেলে এবং তাঁহার কথাবার্তা যেখানে সেখানে বলিতে গেলে লোকে সেরূপ সম্মান না দেখাইতে পারে সেইজন্য প্রথমে নিজের পা জমাইয়া লইতে হইতেছে, বক্তৃতায় বেদান্তের কথা ইত্যাদি বলিতে হইতেছে। তারপর একবার জমিয়া যাইলে তখন তাঁহার কথা চলিবে। আরে বক্তৃতা করা কি আমার কর্ম! এ কারে পড়ে করতে হচ্ছে। বক্তৃতা করি আর নিজে অবাক হয়ে থাকি, বলি মগজ বাবাজি তোমার পেটে এত ছিল! প্রতাপ মজুমদার যে পাঁচ কথা গিয়ে বলছে ও কি করতে পারে? আমরা রামকৃষ্ণের তনয় তাঁহার শক্তিতে সর্বত্র জয়লাভ করিব" ইত্যাদি লেখা ছিল।

প্রেমানন্দ স্বামীর মত বদলান—বাবুরামমহারাজ যদিও গাল পাড়িতেছিলেন ও নানা প্রকার নিন্দাবাদ করিতে ছিলেন কিন্তু পত্রখানি শুনিয়া আবার মত বদলাইয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন, "তাইত, আমরা যে সব কথা বলাবলি কোচ্ছিলুম নরেন যে সেখানে বসে বসে টের পেয়েছে, পত্রেতে যে সেই সব কথা লেখা রয়েছে। এ্যাঁ, এ্যাঁ, তাহলে নরেনের দেখছি শক্তি জন্মেছে। তা-বটেইত

তিনি নরেনকে এত করে ভালবাসতেন আর নরেনের মত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আর কার আছে। নরেন ঠিকই বলেছে নিজেকে একটু দাঁড় করাইতে না পারিলে গুরুকে মানবে কেন? না আর ওসব কথায় কাজ নাই। নরেন যা বলে তাই আমার মত।" বাবুরাম-মহারাজের কথাবার্তা শুনিয়া মনে মনে সকলে সন্তুষ্ট হইলেন ও হাসিতে লাগিলেন। সেই হইতে বাবুরাম মহারাজ আর গাল-মন্দ করিতেন না।

পাদ্রীদিগের ভিতর স্বামীজীর বিপক্ষে সভা—এই সময় খৃষ্টানরা মহা চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং কে, এস, ম্যাকডোনাল নামক জনৈক পাদ্রী একটি ইংরাজী প্যাম্‌ফ্লেট ছাপাইয়া হেদুয়ার ধারে ও বিডন উদ্যানের নিকট বিতরণ করিতে লাগিল। তাহাতে অনেক নিন্দা ও আবোল-তাবোল লেখা ছিল। বিশেষ করিয়া কালীবেদান্তীর উপর নিন্দা ছিল অথচ কালীবেদান্তী সে বিষয়ে কিছুই জানিতেন না—কোন সম্পর্কও নয়। শুধু তাহাতে এলো-মেলো কতকগুলি নিন্দা ছিল। হরমোহন মিত্র সেই প্যাম্‌ফ্লেট লইয়া কালীবেদান্তীর কোন খৃষ্টান আত্মীয়ের নিকট যাইলেন। তিনি ও ম্যাক্‌ডোনাল উভয়ে মিলিযা এই প্যাম্‌ফ্লেট খানি বাহির করিয়াছিলেন। হরমোহন মিত্র যখন আত্মীয়ের সহিত নানাবিধ কথা কহিলেন ও কালীবেদান্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া বিশেষ সম্মান করিতে লাগিলেন তখন বিহারীলাল চন্দ্র বিশেষ লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং অবশিষ্ট পাম্‌ফ্লেট সকল আর বিতরণ করিলেন না।

পাদ্রীদের আর একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হইল। পাদ্রীরা আপনাদিগের মধ্যে একটি সভা করিলেন। হরমোহন মিত্র কোন প্রকারে খবর পাইয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত কথা শুনিতে পাইলেন। পাদ্রীরা গভর্ণমেন্টকে দিয়া কোন প্রকার উৎপাত করাইতে পারে এইরূপ একটি চেষ্টা করিতেছিল এবং সেইভাবে আমেরিকাতে পত্র পাঠাইয়াছিল। হরমোহন মিত্র এই সব কথা শুনিয়া আসিয়া সকলকে বলিয়া দিল। অতুল চন্দ্র ঘোষ একদিন

হাইকোর্ট হইতে ফিরিবার সময় কোন বিশিষ্ট খৃষ্টান উকিলকে এই সকল কথা বলিলেন। খৃষ্টান উকিলটি যদিও স্পষ্ট ভাবে সে কথার কোন প্রত্যুত্তর দিলেন না কিন্তু জিদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন তো হিন্দুদের সহিত ঝগড়া করিবার একটি বাঁধাবাঁধি পথ পেয়েছি। আগে হিন্দুদের সহিত ঝগড়া করিতে যাইলে তাহারা বলিত যে ও শূদ্র বা ও মত আমাদের নয়; এখন একটা বাঁধাবাঁধি পথ পাওয়া গেছে, এখন ঠিক ঝগড়া করতে পারবো।" যদিও তিনি হরমোহন কথিত বিষয়ে অতুলচন্দ্র ঘোষকে প্রত্যুত্তর দিলেন না কিন্তু তাঁহার মুখভঙ্গি ও হাব ভাব হইতে অতুলচন্দ্র ঘোষ বুঝিতে পারিলেন যে গুপ্তভাবে এরূপ একটা কাণ্ড চলিতেছে। অতুলবাবু আসিয়া ঐ সকল কথা সকলকে বলিয়া দিলেন। যাহা হউক খৃষ্টানরা কিছুদিন ধরিয়া এরূপ প্যাম্‌প্লেট, বক্তৃতা ও চিঠি পত্র লিখিয়া আপনাদের ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিল।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ফিরিয়া আসিয়া নানা প্রকার কুৎসা করায় ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহার কথা স্বীকার করিয়া লইল এবং পৌত্তলিক ধর্ম পুনরায় উত্থান করিতেছে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। সন্ন্যাস ধর্মটা যে অতি ভুল পথ ইহা তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিশেষ বাড়াবাড়ি বা কোন অনিষ্টকর ভাবে কার্য করেন নাই, মতভেদ মাত্র বা সাম্প্রদায়িক ভাবে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কার্য কলাপ দেখিয়া সাধারণ হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মদিগের উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। উদাহরণস্বরূপ দুই একটি উপাখ্যান এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

রাজমোহন বসু—মহেন্দ্র মিত্র, সুরেশ মিত্রের মধ্যম ভ্রাতা। তিনি শিয়ালদহ ও হাওড়ার ছোট আদালতে জজীয়তী করিতেন। বয়স বেশ হইয়াছিল। তাঁহাদের বাড়িতে রাজমোহন বসু নামক জনৈক কেশববাবুর সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম সকালবেলা নিত্য আসিতেন ও নানারূপ কথাবার্তা কহিয়া চা পান করিতেন। পাড়া প্রতিবেশী ও

নিত্য যাতায়াত থাকায় তাঁহার সহিত বেশ হৃদ্যতা হইয়াছিল এবং লোকটিও বেশ সৎ ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব এমনি প্রবল যে, একদিন তাঁহাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিল যে প্রতাপবাবু নাকি নরেনের নিন্দা করিতেছেন? রাজমোহনবাবু কেশব বাবুর সমাজের লোক অল্প বিস্তর প্রতাপ বাবুকে সমর্থন কবিয়াছিলেন এবং পৌত্তলিকতার বিপক্ষেও কিছু কিছু বলিতে লাগিলেন। এই আর কি, বৃদ্ধ মণি মিত্তির (মহেন্দ্র মিত্র) ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

প্রথমে উভয়ের কথাবার্তা চলিল, তাহার পর গালাগালি, তাহাব পর জুতা মারিবার উদ্যোগ। বাজমোহন বসু দ্রুতপদে রাস্তা দিযা পলাইতে লাগিলেন এবং বৃদ্ধ মণি মিত্র তাহাকে মারিবার জন্য রাস্তায় ধাবিত হইলেন। রাস্তার লোক এই দুই বৃদ্ধের কাণ্ড দেখিয়া অবাক! সকলেই ত হাসিতে লাগিল যে দুই বৃদ্ধ কি আজ বায়ুগ্রস্ত হইয়াছে। রাজমোহন বসু মহাশয় যদিও পলাইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু মণি মিত্র ফিরিয়া আসিয়া রাগে অনবরত গাল পাড়িতে লাগিলেন। মণি মিত্রের এমন ভাব হইয়াছিল যে নরেন্দ্রনাথকে নিন্দা করা আর তাঁহাকে নিন্দা করা সমান জিনিস। ইহাকেই বলে সাম্প্রদায়িক ভাব বা জাতিগত ভাব।

একদিন ১০টার সময় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট দিয়া হরমোহন মিত্র একখানি দৈ-এর তিজেল হাতে করিয়া লইয়া আসিতেছিলেন, রাস্তা মেরামত হইতেছিল ও ফুটপাতে খোয়া ঢালা ছিল। ফুটপাত দিয়া অফিসের লোক সকল দ্রুত যাতায়াত করিতে-ছিল এবং হরমোহন মিত্রও ফুটপাত দিয়া চলিতেছিলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মর সহিত তাঁহার দেখা হইল এবং ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি অনবধান বশতঃ বলিয়া ফেলিলেন, "কি' হে তোমাদের নরেনের ব্যাপার তো সব শুনা যাচ্চে। প্রতাপবাবু এসে তো সব বলে দিচ্ছে।" এই কথা শুনিবামাত্র হরমোহন মিত্রের ধৈর্যচ্যুতি হইল, তিনি বাতুলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন এবং মুখে ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটিকে অজস্র গালি দিতে লাগিলেন এবং শেষে রাস্তার খোয়া তুলিয়া

তাহাকে এই মারে ত এই মারে। রাস্তার লোকেরা ত ব্যাপার দেখিয়া যে যাহার সরিয়া পড়িল। ব্রাহ্ম ভদ্রলোকটি অপ্রস্তুত হইয়া হরমোহন মিত্রকে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তাঁহার রাগ কমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরমোহন মিত্রের মাথা তখন গরম হইয়া উঠিয়াছিল তিনি তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁহার বাঁ-হাতের দৈ-এর তিজেলটি পড়িয়া যায় নাই।

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ—একদিন বর্তমান লেখক নন্দকুমার চৌধুরীর গলিতে গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের কাছে বৈকালে বসিয়া ছিলেন। ঘোষ মহাশয়ের বয়স হইয়াছিল এবং তিনি ছোট আদালতে ওকালতী করিতেন। সম্মুখের বাড়ি Oxford Mission এর পাদ্রীদিগের বাসস্থান। গোবিন্দবাবুর দরজার চাতালে বসিয়া দুই একটি কথার পর তিনি স্বামীজীর কথা তুলিলেন ও একেবারে প্রদীপ্ত হুতাশনের মত হইলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া Oxford Mission এর দেওয়ালেতে ধাঁই ধাঁই করিয়া লাথি মারিতে লাগিলেন আর চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি এমনি করে মিশনারীদের লাথি মাচ্ছি আর নরেন ফিরে এসে নির্মূল করবে।" তিনি এত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে বর্তমান লেখক তখন আর কোন কথা কহিতে বা হাসিতে পারিলেন না। অবশেষে চলিয়া আসিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন। এইরূপ ঘটনা তখনকার দিনে নিত্য হইত। তখন হিন্দু সমাজের ভিতর ও কলিকাতা সহরের ভিতর এমন একটি চঞ্চল ভাব আসিয়াছিল যে তাহার সামান্য মাত্র আভাস এই দুই একটি উদাহরণে দেওয়া হইল।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের স্বামীজীর বিপক্ষে বিদ্বেষ প্রচার করা—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন যে, নরেন সেই ছোঁড়াটা যে ভ্যাগাবণ্ডের মত পথে পথে ঘুরে বেড়াত, সে এক লম্বা জামা পরে মাথায় পাগড়ি বেঁধে চিকাগো পার্লামেণ্টে তো গিয়ে হাজির। সে আবার লেকচার করতে

উঠলো, আবার বেদান্তের উপর কথা কয়, মায়াবাদ—সে সব অযৌক্তিক কথা, আর পৌত্তলিক ধর্ম সমর্থন করে। এ সব জিনিস কি এযুগে আর চলে! যত সব বাজে জিনিস। ছোঁড়া এমনি অসভ্য রমণীদের সম্মুখে বসিয়াই চুরুট টানিতে লাগিল। আর কি লেক্‌চার করে তার মাথা মুণ্ডু কিছুই নাই, হাউড়ের মতন যত সব আবোল তাবোল বকে, ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রনাথ সেন ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—এই সময় বাঙ্গালী-দিগের ইংরাজী ভাষায় দৈনিক পত্র একমাত্র 'ইণ্ডিয়ানমিরার' ছিল অপর সমস্ত কাগজ গুলি সাপ্তাহিক ছিল। নাম, যশ ও নির্ভীকতায় 'ইণ্ডিয়ানমিরার' তখন শ্রেষ্ঠ ছিল। নরেন্দ্রনাথ সেন তখন সম্পাদক ছিলেন এবং যখন যে বিষয় লেখা উচিত বিবেচনা করিতেন তখন নির্ভীকভাবে তাহাই লিখিতেন,কাহাকেও বড় ভয় ডর করিতেন না।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যখন নানা স্থানে স্বামীজীর নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সকল কথা শুনিয়া মহা-ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যদিও নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট-কুটুম্ব কিন্তু ন্যায় অন্যায় বিচার করিয়া নরেন্দ্রনাথ সেন নির্ভীক-ভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি আপন বৈঠকখানায় বসিয়া সকলের সম্মুখে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে মুখ ছুটাইয়া গালি দিতেন। রাগের মাথায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক যে প্রকার বলিতে পারেন তিনি সেই প্রকার বলিতেন। তিনি তাহার ভিতর একটি কথা বলিয়া ছিলেন যদ্দারা তাঁহার নিজের আভ্যন্তরিক ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ দেখি একটা বাঙ্গালীর ছেলে নিঃসম্বল, বিদেশ ভূমিতে গিয়া নিজের দেশের জন্য, নিজের জাতের জন্য নিজের ধর্মের জন্য লড়াই কচ্ছে, আর কি করে বিদেশীর কাছে এদেশের একটুমাত্র সম্মান হয় তার চেষ্টা কচ্ছে আর এইটা এক বুড়ো মিন্‌সে কোথা তাকে সেখানে তার হয়ে দুটো কথা বলবে না তার নিন্দাবাদ করে কিসে তার অনিষ্ট হয় তার চেষ্টা কচ্ছে। লোকটার বুকে এতটুকুও কি Patriotism নাই? এরাই হচ্ছেন বলিয়ে কইয়ে লোক!" যদিও

তিনি আপনার বৈঠকখানায় মুখ খুলিয়া আপনার প্রাণের কথা বলিতেন, কিন্তু কাগজে একটু সংযতভাবে লিখিতেন। সংবাদপত্রে নরেন্দ্রনাথ ভবিষ্যতে কিরূপ হইবে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব কেশব বাবুর নিকট কিরূপ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন এবং কেশববাবু হইতে নরেন্দ্রনাথ কত শ্রেষ্ঠ হইবেন এই প্রকার সমস্ত পুরাতন কথা তুলিয়া তিনি প্রত্যহ 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' লিখিতে লাগিলেন। এই কয়েক মাসের 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পড়া আবশ্যক, কারণ তাহাতে অনেক স্বামীজীর বিষয় জানিবার ও শিখিবার কথা আছে।

নরেন্দ্রনাথ সেন 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' প্রত্যহ স্বামীজীর বিষয় সুখ্যাতি করিয়া লেখাতে শীঘ্রই একটা হাওয়া পরিবর্তন হইয়া যাইল। দেশের ভিতর একটা জাতিগত সম্মান ও জাতিগত প্রেম উদ্ভূত হইল। সকলেই হিন্দু নামে পরিচয় দিতে শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক বলিয়া পূর্বে যেমন আপনাদিগকে হীন বা আম্‌তা আম্‌তা ভাবে কথা কহিতেন সে ভাবটা কাটিয়া গেল। বুকে একটা দৃঢ়তা আসিল এবং নিজেরা যে খৃষ্টান ও ব্রাহ্মদিগের চাইতে ধর্মভাবে অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এইরূপ একটি তেজী ভাব উঠিল। মোট কথা বুকে ও হাত পায়ে সকলের যেন একটু তেজ আসিল। জাতিগত ভাবের এই প্রথম অভ্যুদয়। মুমূর্ষু বিষণ্ণভাব ত্যাগ করিয়া গম্ভীর তেজী ভাবটি ধীরে ধীরে সকলের ভিতর আসিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ সেন 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' এই সময় বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন সেইজন্য তাঁহাকে এইস্থলে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাপক এন ঘোষ—সুবিখ্যাত অধ্যাপক এন. ঘোষের 'ইণ্ডিয়ান নেশন' নামে একখানি ছোট সাপ্তাহিক পত্র ছিল। স্বামীজীর যেমন দ্বিতীয় বক্তৃতাটি কলকাতায় আসিল, তিনি তাঁহার পত্রে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও অবজ্ঞা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। ইহাতে সকলের মনে বড় কষ্ট হইয়াছিল কারণ এন. ঘোষ পণ্ডিত লোক হইয়াও বিরোধী হইলেন। কিন্তু পরের সপ্তাহে তাঁহার পূর্বপ্রবন্ধ প্রকাশ

করায় যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন এবং তখন হইতে সহায় স্বরূপ হইয়া মিত্রভাবে কয়েকবার লিখিতে লাগিলেন। সেই সময় পূর্বপ্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহাকে একবার জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে মাদ্রাজ হইতে কে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়া দেয়, অনবধানতা বশতঃ সেটা বিশেষ না পড়িয়াই সম্পাদকীয়স্তম্ভে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই ভুলের জন্য তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তদবধি এন ঘোষ স্বপক্ষে হইয়াছিলেন।

এই সময় থিওসফিষ্টরা মাদ্রাজ হইতে ধর্মপালকে কলিকাতার ক্রীক্ রোতে একখানি পত্র পাঠান। তাহাতে তাহাদের ভিতরকার অনেক কথা ছিল। জনৈক ব্যক্তি তখন ধর্মপালের "মহাবোধি" কাগজে সাময়িক সম্পাদকের কার্য করিতেন। তিনি পত্রখানি পড়িয়া তুলিয়া রাখিয়া দেন ও পত্রের সমস্ত কথা ২ নং নয়ন-চাঁদ দত্তর গলিতে হরমোহন মিত্রের বাড়িতে আসিয়া হরমোহন মিত্র, ভুপেন্দ্রনাথ বসু, সুরেশ দত্ত ও বর্তমান লেখকের সম্মুখে বলিয়া দেন। সেই সমস্ত কথা বর্তমান লেখক আলমবাজার মঠে গিয়া শিবানন্দ স্বামীর নিকট বলিয়া আসেন। স্বামীজী ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাদ্রাজে থিওসফিষ্টদের ভিতর উক্ত কথা প্রকাশ করেন এবং বলেন যে সেই পত্র এখন পর্যন্ত আছে। তখন সেই ব্যক্তি আইন মতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য স্পষ্টভাবে কথার অপলাপ করে কিন্তু পত্রখানি যে আসিয়াছিল তাহা অতি সত্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বহস্তে পত্র লেখা—আমেরিকার চিকাগোর সংবাদ যখন কলিকাতা সহরে প্রকাশিত হইল এবং সেই বিষয় লইয়া যখন সকলে আলোচনা করিতে লাগিলেন সেই সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বহস্তে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া তাঁহার দারোয়ান মারফৎ ৩নং গৌরমোহন মুখার্জির গলির বাড়িতে পাঠাইয়া দেন। নরেন্দ্রনাথের খুল্লতাত তারকনাথ দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এষ্টেট-এর উকিল ছিলেন এবং তারকনাথ দত্তের

ঠাকুর পরিবারের সহিত বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। নরেন্দ্রনাথ তারকনাথ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র এইজন্য হর্ষিত হইয়া মহর্ষি পত্রখানি স্বহস্তে লিখিয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তখন নরেন্দ্রনাথদের সাংসারিক অবস্থা বিশেষ জানিতেন না। কারণ নরেন্দ্রনাথের জননী ও অন্যান্য ভাইয়েরা তখন রামতনু বসুর গলির বাড়িতে বাস করিতেন। অবস্থা তত স্বচ্ছল নয়। দুঃখের বিষয় গৌরমোহন মুখার্জির বাড়িতে যাঁহারা তখন বাস করিতেন তাঁহারা সেই পত্রখানি লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলেন। সেই জন্য সেই পত্রখানি সাধারণের নিকট অপ্রকাশিত হইয়া রহিল।

স্বামীজীর আলাসিঙ্গাকে সভা করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া—স্বামীজী যখন অসহায় অবস্থায় প্রচার কার্য কবিতেছিলেন তখন ভারতবর্ষ হইতে নানা সম্প্রদায় গুপ্তভাবে সংবাদপত্রে ও বন্ধু মহলে পত্রাদি লিখিয়া স্বামীজীকে অপদস্থ ও অপমানিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই স্বামীজীর নিকট ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহার প্রতিকারের আবশ্যক বিবেচনা করায় তিনি মাদ্রাজে আলাসিঙ্গাকে এক পত্রে লিখিলেন, "একটা জিনিস করা আবশ্যক, যদি তোমরা পার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। তোমরা মাদ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান কর, তাহাতে রামনাদের রাজা বা ঐরূপ কোন লোককে সভাপতি করিয়া ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়া লও যে আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছ। তাহারপর সেই প্রস্তাবটি 'চিকাগো হেরাল্ড,' 'ইণ্টারওস্যান' প্রভৃতি কাগজে পাঠাইয়া দাও। কয়েক কপি ধর্ম মহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাইয়া দিবে। এক কপি ডেট্রয়েটের মিসেস্ জে, জে, ব্যাগির নামে পাঠাইবে। এই সভাটি যত বড় হয় করিবার চেষ্টা করিবে। যত বড় বড় লোককে পার ধরিয়া নিয়া আসিয়া এই সভায় যোগ দেওয়াইবার চেষ্টা করিবে—তাহাদের ধর্মের জন্য, দেশের জন্য, এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজ ও তাঁহার

দেওয়ানের নিকট হইতে সভা ও উহার উদ্দেশ্য সমর্থন করিয়া চিঠি লইবার চেষ্টা করিবে। মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও উহাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা করিবে। এখানকার সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কলিকাতায়ও ঐরূপ চেষ্টা করিবে।"

যদিও তাহাতে তাঁহার নিজের কোন্ মান সম্ভ্রম আসিয়া যায় না কিন্তু ইহাতে কার্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। অর্থাৎ তিনি যে সমস্ত হিন্দু জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ বা পক্ষ হইতে ধর্ম প্রচার করিতেছেন এবং ভারতবর্ষে তাঁহাকে অনেক বিশিষ্ট লোক ও পণ্ডিত মণ্ডলী যে জানেন সেইটি তিনি আমেরিকাবাসীদিগকে দেখাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার বিপক্ষবাদীরা নানারূপ কুৎসা প্রচার করিয়া গুপ্তভাবে পত্রাদি পাঠাইতে লাগিল। এই সময়টি তাঁহার জীবনে ভীষণ সময় হইয়াছিল। একদিকে নিরাশ্রয়, দূরদেশে গিয়া খৃষ্টানদের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতেছেন, ভারতবর্ষের গৌরব ঘোষণা ও হিন্দুধর্ম স্থাপন করিবার প্রয়াস করিতেছেন আর অন্যদিকে তাঁহার জাতি ভাইয়েরা নানারূপ কুৎসা গুপ্তভাবে বিদেশে তাঁহার বিপক্ষে প্রচার করিতেছে। জাতির বা সমাজের নীচ অবস্থা ও সঙ্কীর্ণ-ভাব এই সময়ে স্পষ্ট দেখা দিয়াছিল।

স্বামীজীর আলাসিঙ্গাকে পত্র লেখা—কিছুদিন পরে পুনরায় স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে একখানি পত্রে লেখেন, "সভার খানকতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদ পত্রে প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করবে—মিশনারিরা আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে আমি কারও প্রতিনিধি নই—এতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে। বৎস, কাজ কি করে করতে হয় শেখো। সব চেয়ে দস্তুরমত উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজ প্রভৃতি প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাত দিয়ে আসা চাই তবেই সেটি একটি নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হবে। আমি এই

কথা লিখছি, তার কারণ এই যে আমার মনে হয়, তোমরা অন্য জাতের আদব-কায়দার দস্তুর জান না। যদি কলিকাতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে এই রকম সব আসে, তা হলে আমেরিকানরা যাকে বলে Boom, তাই পাব আর যুদ্ধের অর্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি ইত্যাদি।" পত্রখানি খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। সেই পত্রখানি পাইয়া আলাসিঙ্গাও খুব কাজে মাতিয়া যাইল এবং সভা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্বামীজীর কলিকাতায় জনৈককে পত্র লেখা—এদিকে কলিকাতায়ও জনৈক ব্যক্তিকে স্বামীজী এক পত্রে লিখিলেন, "ভারতের খৃষ্টানেরা যা কিছু বলছে মিশনারিরা তা খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করছে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন তার চেষ্টা করছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভাল রকমই সিদ্ধ হয়েছে, কারণ ভারতবর্ষ থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বলছে না। তজ্জন্য এদেশের অনেকে মনে করে আমি একটি জুয়াচোর তোমরা সেখানে আমার খুব সুখ্যাতি করিতে পার কিন্তু তার একটা কথাও এ দেশে পৌঁছায় নি।

একে ত মিশনারিরা আমার পিছু লেগেছে তাহারপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, এক্ষেত্রে আমার একটা কথাও জবাব দেবার নাই। আমি কোন নিদর্শন পত্র নিয়ে আসিনি আর যখন কারও অর্থ সাহায্যের আবশ্যক হয় তার নিদর্শন পত্র থাকার প্রয়োজন, তা না হলে মিশনারি ও ব্রাহ্ম সমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে আমি যে জুয়াচোর নই তা কি করে প্রমাণ করবো? মনে করেছিলাম মাদ্রাজে ও কলিকাতায় কতকগুলি ভদ্রলোক জড় করে এক একটা সভা করে আমাকে এবং আমেরিকা-বাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার করবার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে সেই প্রস্তাবটি যথা নিয়মে এখানে পাঠাবে কিন্তু এখন দেখছি ভারতের পক্ষে এ কাজটা বড় গুরুতর ও

কঠিন। এক বৎসরের ভিতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না—আর এখানে সকলে আমার বিপক্ষে।" একদিকে যেমন হতাশ ও দুঃখপূর্ণ আবার অন্যদিকে মহা তেজস্বী ও নির্ভীক ভাবের পত্রখানি ছিল। স্বামীজী এই সময় মজুমদারের লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত চাহিয়া পাঠান। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার জন্য স্বামীজী সকলকে উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিলেন।

যাহা হউক আলাসিঙ্গা মাদ্রাজে একটি সভা করিয়া অভিনন্দন প্রেরণ স্থির করিলেন। সেই সভায় স্থির হইল যে স্বামীজী কোন সম্প্রদায় বা কোন বিশিষ্ট বর্ণের তরফ হইতে আমেরিকায় যান নাই, তিনি সমগ্র হিন্দুজাতি ও সর্বপ্রকার হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছেন। মাদ্রাজে সভা হইল এবং অভিনন্দন লিখিয়া এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা হইল যে তিনি যেন সেই অভিনন্দনটি যথা নিয়মে আমেরিকায় পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ব্যক্তিটি এমনি অকর্মণ্য যে সেই কাগজখানি লইয়া নিজের টেবিলের টানার ভিতর পুরিয়া রাখিয়া দিলেন এবং মাসখানেক আর সে বিষয় উচ্চবাচ্য করিলেন না। আলাসিঙ্গাও মনে করিয়াছিল যে অভিনন্দনটি সে নিশ্চয় পাঠাইয়া দিয়াছে কিন্তু সমস্তটাই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইয়াছিল।

অবশেষে স্বামীজী পক্ষান্তরে সংবাদ পাইয়া শশীমহারাজকে কলিকাতায় একটি সভা করিয়া প্রেসিডেন্ট ব্যারোজ, আমেরিকান সমাজ ও স্বামীজী এই তিনটি বিষয় করিয়া অভিনন্দন পাঠাইতে বলিলেন এবং আরও লিখিয়াছিলেন যে কার্যটির বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে কারণ তখন স্বামীজীর বিপক্ষে আমেরিকার খৃষ্টান পাদ্রীরা বহু কুৎসা প্রচার করিতেছিল। এই খবর পাইয়া শশীমহারাজ আলাসিঙ্গাকে ধমক দিয়া এক কড়া চিঠি লিখিলেন যে আহাম্মকটা সব করেছে কিন্তু কাগজটি যে ডাক-ঘরে গিয়ে পাঠাতে হয় তা তাহার মাথায় আসে না ইত্যাদি। যাহা হউক শশীমহারাজ

কালীবেদান্তীর সহিত পরামর্শ করিয়া অতি শীঘ্র একটি সভা করিয়া স্বামীজীকে অভিনন্দন প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় সভা করিবার জন্য অভেদানন্দ স্বামীর উদ্যম— কালীবেদান্তী মঠ হইতে আসিয়া বলরাম বাবুর বাড়িতে রহিলেন এবং সান্ন্যাল মহাশয়, শরৎমহারাজ ও অন্যান্যের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য স্থির করিলেন। মনোমোহন মিত্র অফিস হইতে আসিয়া যতটুকু সময় পাইতেন ততটুকু এই কার্যে থাকিতেন এবং অপর অনেক লোকও ইহার ভিতর ছিল। কালীবেদান্তী মহা উদ্যমে কলিকাতার বিশিষ্ট ভদ্রলোকদিগের বাড়িতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার কথাবার্তা কহিয়া অনেককে রাজি করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল বাঙ্গালীকে লইয়া সভা করিলে তো আর চলিবে না সেইজন্য বড়বাজারের মাড়োয়ারীদিগেরও নিকট যাইতে লাগিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় কালীবেদান্তী, হরমোহন মিত্র, মনোমোহন মিত্র ও আর কয়েকজন লোক মিলিয়া বড়বাজারের এক বিশিষ্ট মাড়োয়ারীর বাড়িতে যান ও আপনাদের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। মাড়োয়ারী মহোদয় কথা শুনিয়া ত প্রথম সুরু করিলেন, "সব ভ্রষ্ট হ্যায়! হিন্দু হয়ে ফিরিঙ্গিদের দেশে গিয়ে ফিরিঙ্গির সহিত আহার করিতেছে, ও লোক ত ভ্রষ্ট হ্যায়" ইত্যাদি। তর্ক বা যুক্তিতে তাঁহাকে বোঝান অতি কষ্টকর অথচ সভাতে মাড়োয়ারীর উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। মনোমোহন মিত্র মাড়োয়ারীর আচার ব্যবহার বেশ বুঝিতেন, তিনি দেখিলেন যে তর্কে কিছু হইবে না সেইজন্য হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বাবুজী আপকো নাম কোম্‌টি মে চড়্ গিয়া।" কোম্‌টি মে নাম চড়্ গিয়া ইহা এক মস্ত ব্যাপার অর্থাৎ কোম্‌টিতে তিনি সভ্য বলিয়া নির্বাচিত হইয়াছেন—সে হইতেছে লক্ষণের গণ্ডী, পার হইবার আর উপায় নাই। সেই কথা শুনিয়া মাড়োয়ারী মহোদয় অমনি নিজের মত পরিবর্তন করিয়া স্বপক্ষ হইয়া যাইলেন। এইজন্য অদ্যাপিও হাসির কথা আছে 'কোম্‌টি মে নাম চড় গিয়া'-আর কোন কথা চলিবে না।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতি হইবার অমত—সভাপতি নির্বাচন করিবার জন্য শ্রীমনোমোহন মিত্র, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন্দ্র কুমার বসু, চারুচন্দ্র বসু ও অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবাব পর পট্টবস্ত্র পরিধান কবিয়া গুরুদাস বাবু বাহিরে আসিলে তাঁহাকে প্রস্তাবিত সভায় সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করা হয়। তিনি হিন্দু সমাজের এক জন বিশিষ্ট ধর্মপরায়ণ ও মাননীয় লোক এজন্য তাঁহারই এরূপ সভায সভাপতিত্ব গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় একথা তাঁহাকে বলিলে প্রথম হইতেই স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহহীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা হয়। পরে তিনি বলেন যে কোন বিশিষ্ট মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গুরুদত্ত নহে, শাস্ত্র মতে শূদ্রেব সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকার আছে কি না এসম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে এবং সন্ন্যাসী হইয়া ম্লেচ্ছদেশে গমনেও বিশেষ প্রত্যবায় আছে ইহাও অনেকে বলিয়া থাকেন,—"দেখুন, আমি আর এই বৃদ্ধ বয়সে কোন ধর্ম সভায় বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট বা সভাপতি হইব না এরূপ স্থির করিয়াছি। বিশেষতঃ যে সব কার্যে সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধে মতভেদ আছে সে সব কাজের ভিতর আর আমি যাইতে চাই না।" ইহা শুনিয়া মনোমোহন মিত্র বলিলেন, "আপনি বৃদ্ধ বয়সের যে কথা বলিলেন তাহা হলে আমরা বলি আপনিও পঞ্চাশের উর্ধে গিয়াছেন শাস্ত্র হিসাবে ত আপনার কাজ কর্ম ছাড়িয়া বনে যাওয়া উচিত।" উত্তরে গুরুদাস বাবু বলেন, "আমি তা পাচ্ছি কই।" তাহাতে মনোমোহন মিত্র বলেন যে যতদিন আছেন ততদিন ধর্ম কার্যে যোগদান করা উচিত। ইহার উত্তরে গুরুদাস বাবু বলেন, "আপনারা দেখিবেন যে কখন আর আমি প্রকাশ্য ধর্ম সভায় যোগদান করিব না।" নগেন্দ্রনাথ মিত্র বলিয়া উঠিলেন, "আপনি যে ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ার দোষ দিলেন কিন্তু আপনি ত শুদ্ধ আচারী ব্রাহ্মণ হইয়াও

চিরকাল ম্লেচ্ছের চাকরী করিলেন, এতে যে শাস্ত্রে তুষানলের ব্যবস্থা রয়েছে”, এই বলিয়া সকলেই ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া আসিলেন। এই কথা শুনিয়া গুরুদাস বাবু এঁ্যা, এঁ্যা করিতে লাগিলেন।

পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়—ইহার পর জন কয়েক লোক রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত দেখা করিতে উত্তরপাড়ায় যান এবং তাঁহাকে সভাপতি হইতে বলা হইলে তিনি স্বামীজীর বিষয় শুনিতে চাহেন। তাঁহাকে আমেরিকান কাগজে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার কতকগুলি cutting দেখান হয় তন্মধ্যে 'After hearing him we feel how foolish it is to send missionaries to this learned nation' এই অংশটুকু পড়িয়া তিনি বিশেষ ভাবে আনন্দিত ও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, “আর আপনাদের কোন কিছু বলিতে হইবে না। তিনি আমেরিকায় গিয়া হিন্দু ধর্মের পক্ষে এই যে সম্মান লাভ করিতে পারিয়াছেন তজ্জন্য India should remain eternally grateful to him”।

কলিকাতায় সভা—১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে টাউনহলে সভা হইল। টাউন হল তখন মেরামত হইতেছিল সেইজন্য উপরকার হলটির মধ্যস্থলে সভা হয়। রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি হইলেন। এই সভায় পণ্ডিত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায় নন্দলাল বসু বাহাদুর, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন, ক্যামখ্যানাথ তর্কবাগীশ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিতীর্থ, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান নেশন সম্পাদক মিঃ এন. ঘোষ, মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, ডেলি নিউজ সম্পাদক ডাক্তার জে. বি. ড্যালী, ন্যাশনাল গার্জেন সম্পাদক বাবু শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, হোপ সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রায় শিউবক্স বগ্‌লা বাহাদুর, মিঃ জে. পাদশা, সিংহলের রাইট্ রেভারেণ্ড এন. সাধনানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত স্তার রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজা স্তার রাধাকান্ত দেবের পুত্র রাজা

রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর ও আর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অসুস্থতা নিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া সহানুভূতি সূচক পত্রাদি লিখিয়াছিলেন। বর্তমান লেখকও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ এন্-ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও হেমেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মিঃ এন্. ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ও হেমেন্দ্রনাথ মিত্রের বক্তৃতা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অল্প সামান্য বলিয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে কিছু বলিতে বলায় তিনি চেয়ার হইতে উঠিয়া প্লাটফরমে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া গম্ভীরভাবে 'Yes' বলিয়া পুনরায় চেয়ারে বসিলেন। তিনি এমন গম্ভীরভাবে 'Yes' কথাটি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার কথা শুনিয়া কাহারও হাসিবার সামর্থ ছিল না কারণ তাঁহার 'Yes' কথাটি তাঁহার বক্তৃতার আদি ও অন্ত শব্দ। তিনি 'Yes' কথাটি বলিয়া কিছুমাত্র অপ্রতিভ হন নাই।

পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের স্বামী বিবেকানন্দ বলায় আপত্তি— রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'স্বামী বিবেকানন্দ' কথাটিতে আপত্তি করিয়া 'Brother বিবেকানন্দ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন কারণ কায়স্থ সন্ন্যাসী হইতে পারে কি না এ বিষয়ে তখনও তাঁহার সন্দেহ ছিল। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—(১) এই সভা হিন্দু ধর্মের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ, চিকাগোর বিরাট ধর্মসভায় যে মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন ও পরে আমেরিকার অন্যান্য স্থানে যে সকল কার্য করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছেন।

(২) এই সভা চিকাগো মহাসভার সভাপতি ডাঃ জে. এইচ. ব্যারোজ, বিজ্ঞানশাখার সভাপতি মিঃ মারউইন মেরী স্নেল ও সাধারণ ভাবে সকল আমেরিকাবাসীকে স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি

সহৃদয় ও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন।

(৩) এই সভা, উপরোক্ত দুইটি প্রস্তাব যথাক্রমে উপরোক্ত ব্যক্তি ত্রয়কে ও অভিনন্দন পত্রখানি স্বামী বিবেকানন্দকে পাঠাইবার জন্য সভাপতি মহাশয়কে অনুরোধ করিতেছেন।

সভা ভাঙ্গিয়া যাইবার পর কালীবেদান্তী কেবল্ (Cable) করিয়া ডাঃ ব্যারোজ, আমেরিকান সমাজ ও স্বামীজীকে তিনখানি অভিনন্দন পাঠাইয়া দিলেন এবং পরবর্তী ডাকে স্বামীজীকে অভিনন্দন পত্রখানি পাঠাইয়া দিলেন। কালীবেদান্তী প্রাণ-পণে এই সময় খাটিয়া ছিলেন। উন্মাদের মত তিনি দিন রাত্র কাজ করিয়া টাউন হলের সভা করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সভার কার্য প্রণালী মুদ্রিত করা এবং সেই সভার রিপোর্টগুলি নানা প্রেসে পাঠান প্রভৃতি সমস্ত কার্যই তিনি সাধনার মত করিয়াছিলেন। এই টাউন হলের সভার পর হইতে কলিকাতা ও বাঙ্গালা দেশে নানা স্থলে সভা করিয়া অভিনন্দন দিবার হুজুগ লাগিয়া যাইল। শেষকালে ইহা একটি হাস্য কৌতুকের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

রাজা অজিৎ সিং-এর সভা ও নানাস্থানে সভা—খেতড়ির রাজা অজিৎ সিং বাহাদুর তাঁহার প্রজামণ্ডলী লইয়া এই উপলক্ষে বৃহৎ দরবার করিয়া স্বামীজীকে অভিনন্দন পাঠান এবং জানান যে স্বামীজীর প্রত্যেক কার্যেই রাজাসাহেবের অনুমোদন আছে। রাজন্যবর্গ অতি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া তাঁহার কার্য আদর করিয়া থাকেন। রামনাদ ভাস্কর সেতুপতি তাঁহাকে তার যোগে হৃদয়ের আনন্দ জানাইলেন। মান্দ্রাজ হইতে রাজা স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার, দেওয়ান বাহাদুর স্যার সুব্রহ্মণ্য আয়ার সি. আই. ই. ও অন্যান্য বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি সভা করিয়া স্বামীজীর কৃতকার্যতার জন্য বক্তৃতা দিয়া তাঁহাকে আপনাদের সহানুভূতি জানাইলেন। ইহা ব্যতীত নানা স্থান হইতে সভা করিয়া স্বামীজীকে অভিনন্দন পাঠাইতে

লাগিল। এইরূপে ভারতের নানা স্থান হইতে আমেরিকায় স্বামীজীর কার্যে সহানুভূতি প্রকাশ পাওয়ায় পাদ্রীদের প্রতিবন্ধক ভাব কিছু কম পড়িল এবং স্বামীজীরও কার্য করিবার একটু সুবিধা হইল। তখন তিনি বেশ গম্ভীর হইয়া পাদ্রীদিগের নিন্দাবাদ উপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক সহরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচিত হওয়ায় তিনি বেশ দৃঢ়চিত্তে প্রচার কার্য করিতে লাগিলেন।

মাদ্রাজ হইতে যে অভিনন্দন পাঠান হইয়াছিল স্বামীজী চিকাগোতে জর্জ হেলের বাড়িতে বসিয়া তাহার প্রত্যুত্তর লিখিয়া শশীমহারাজকে এক প্রস্থ পাঠাইয়াদেন। বোধ হয় আলাসিঙ্গাকে প্রথম না পাঠাইয়া শশীমহারাজের মারফৎ আলাসিঙ্গাকে দিতে বলিয়াছিলেন। সেই সময় আমেরিকার সংবাদ পত্রের অনেক প্রবন্ধ ও মন্তব্য কলিকাতায় আসিয়া পড়িল। কালীবেদান্তী সেইগুলি 'ইণ্ডিয়ানমিরার' পত্রিকায় কিছু কিছু করিয়া প্রকাশ করিলেন। আলমবাজার মঠে বসিয়া শশীমহারাজ মাদ্রাজ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরটি পড়িতে লাগিলেন আর সকলে বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিলেন। শশীমহারাজ পড়িতে পড়িতে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একেবারে গরম হইয়া উঠিলেন। সে কি গলার আওয়াজ! কি মুখভঙ্গি! কি বুক ফুলাইয়া বসা! শশীমহারাজ যেন স্বয়ংই সেই বক্তৃতা করিতেছেন। সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার পড়িয়া যাইল। প্রত্যেক লোকের ভিতর যেন মহাবীরের ভাব উঠিতে লাগিল। প্রত্যেকেই যেন বিশ্ববিজয়ী হইয়াছিল। এইরূপ সাহসিকতাপূর্ণ উত্তেজিত বাণী বোধ হয় পূর্বে বাঙ্গালীর ভিতর হয় নাই।

প্রত্যেক স্থানে স্বামীজীর বিষয় আলোচনা—দুই চারিদিনের ভিতর সমস্ত বক্তৃতাটি পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সহরে এক হুলুস্থুল পড়িয়া যাইল। কি ট্রাম গাড়ির ভিতর, কি স্কুল কলেজের ছেলেদের ভিতর, কি অফিসে, যেখানে সেখানে, বাঙ্গালী জাতির আত্মশক্তির বিকাশ পাইতে লাগিল। জাতিগত ভাব, জাতিগত ইচ্ছা ও

জাতিগত প্রাধান্য সেইদিন হইতে প্রথম জাগিয়া উঠিল। হাটে, বাজারে এমন কি গঙ্গার ঘাটে স্ত্রীলোকদিগের ভিতর বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর কথা আলোচনা হইতে লাগিল। একের বিজয় যেন সকলেব বিজয় হইয়া উঠিল। একের গৌরব যেন সকলের গৌরব। এইরূপ ভাব আর কখন বাঙ্গালী জাতির ভিতর দেখা যায় নাই। সেই সময় হইতে প্রকাশ্যে কেহ আর স্বামীজীর বিপক্ষে নিন্দা করিতে সাহস করিত না কারণ তাহা হইলে যুবকদিগের নিকট প্রহার খাইবার সম্ভবনা ছিল। যুবকেরা তখন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবিলম্বে সেই বক্তৃতাটিতে সংস্কৃত শ্লোক বসাইয়া প্যামফ্লেট করিয়া প্রকাশিত হইল।

পাথুরিয়াঘাটার সুপ্রসিদ্ধ গুরুচরণ ঘোষ মহাশয় স্বামীজীকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি সংস্কৃততে বক্তৃতা করেন না কেন? স্বামীজী তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তরে উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া লেখেন যে সেখানে সংস্কৃত সামান্য লোক বোঝে এবং অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরেও উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে খেতড়ির রাজার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর আসিল এবং প্রকাশিত হইল।

স্বামী নিরঞ্জনানন্দ—টাউন হলে সভার কয়েক মাস পুর্ব হইতে নিরঞ্জনমহারাজ মাদ্রাজে ছিলেন। তিনি বর্তমান লেখককে পত্র লেখেন যে টাউন হল সভায় কি কি হইয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে। বর্তমান লেখক তাঁহার আজ্ঞা অনুসারে সমস্তটা সংক্ষেপে লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এন. ঘোষ তাঁহার বক্তৃতাকালে উত্তেজিত হইয়া অনেক উত্তেজনাপূর্ণ বাণী বলিয়াছিলেন। তাঁহার ভিতর একটি কথা ছিল, "Well might Vivekananda say,—In my days of troubles and obscurities you recognised me not. Now that I am known to many and shall be known wheresover I go now, you are going to establish kinship with me." এই কথাগুলি তিনি উচ্ছসিতভাবে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বক্তৃতাটি

মুদ্রিত করিবার জন্য তাঁহাকে দেখান হয় তখন তিনি ঐ সমস্ত কথা বাদ দিয়া দেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "সভায় উত্তেজিত হইয়া অনেক কথাই বলিয়াছি কিন্তু কাগজে সেগুলি ছাপান ঠিক নয় ঐ অংশটি বাদ দেওয়াই ভাল।"

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামীজীর সন্ন্যাসীরগীতি অনুবাদ করা—কিছুদিনের পর স্বামীজী লিখিত একটি ইংরাজী কবিতা 'Songs of Sannyasin' (সন্ন্যাসীব গীতি) শশীমহাজের নিকট আসিল। শশীমহারাজ সেই কবিতাটি পাইয়া একেবারে আনন্দে উল্লসিত হইলেন এবং ছন্দে বাঙ্গালা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালা ছন্দে কবিতাটি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কবিতাটিও দেশের মধ্যে খুব আন্দোলন তুলিয়াছিল। পাদ্রীরা সেই কবিতা পড়িয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল যে স্বামীজী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আর কি এইবার বিবাহ করিয়া আমেরিকায় বাস করিবেন। পাদ্রীরা বিদ্রূপ করিতে কখনই বিরত হয় নাই।

স্বামীজীর 'হিন্দু বিধবা আশ্রমে' অর্থ দান—প্রথম প্রথম স্বামীজী বিনামূল্যে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু বক্তৃতা বিনামূল্যে শুনিতে আমেরিকানরা অনিচ্ছুক; উহা নিম্ন শ্রেণীর ভিতর হইয়া থাকে এইজন্য তাহারা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। স্বামীজী বলিতেন যে তিনি ধর্ম বিক্রয় করিয়া অর্থ উপার্জন করিবেন না। অবশেষে স্থির হইল যে একজন কণ্ট্রাক্টর টিকিট বিক্রয়ের ভার লইবে এবং তিনি নিজে একটা নগদ টাকা স্বামীজীকে দিবেন বাকি লাভ তাহার নিজের হইবে। স্বামীজী সেই টাকা কোন সৎকার্যে দান করিবেন। বরাহনগরে শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু বিধবা আশ্রমের' কথা স্বামীজীর মনে সদা সর্বদা থাকিত। শশীপদ বাবু পাঁচজনের নিকট হইতে অর্থ লইয়া এই আশ্রমটি চালাইতেন। ব্রুকলিন নৈতিক সভার সমক্ষে তিনি 'হিন্দু রমণীর আদর্শ' (The ideals of Hindu woman) শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন। স্বামীজী বক্তৃতা সভায় প্রবেশ করিয়াই বলিলেন যে অদ্যকার টিকিট বিক্রয়ের

অর্থ অমুক কার্যে প্রদত্ত হইবে। অর্থাৎ সমস্ত অর্থ বরাহনগরের 'হিন্দু বিধবা আশ্রমের' কার্যে যাইবে। এই কথা প্রথমে বলিয়া তবে তিনি বক্তৃতা দেন। সেই সভার শ্রোতৃবর্গরা ইচ্ছা পূর্বক অনেকে চাঁদা দিয়াছিল। ঐ বক্তৃতা উপলক্ষে যত টাকা উঠিয়াছিল তাহা তিনি সভাপতি মহাশয়কে শশীপদ বাবুর বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিতে বলেন। তদনুসারে সভাপতি ডাক্তার লুইস্ জেমস্ (Dr. Lewis C. James) মহোদয় শশীপদ বাবুকে একখানি পত্রের সহিত উক্ত টাকা পাঠাইয়া দেন। কিছুদিন পরে আশ্রমটি উঠিয়া যায়।

এই সময় একদিন বৈকালবেলা মন্মথনাথ ভট্টাচার্য ও তাহার ভ্রাতা মনীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উভয়ে আলমবাজার মঠে যান। স্বামীজী মাদ্রাজে অবস্থানকালে তাঁহার বাড়িতে ছিলেন সেইজন্য মঠের সকলে মন্মথনাথ ভট্টাচার্যকে বিশেষ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন এবং তিনিও স্বামীজীর বিষয় একটু আধটু কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিলেন। যাহা হউক স্বামীজীর প্রতি তাঁহার যে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল ইহাই তিনি বেশ স্পষ্টভাবে সেই দিন দেখাইয়াছিলেন।

স্বামীজী যখন অর্থ লইয়া বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন তখন তিনি অনেক অর্থ পাইয়াছিলেন। ডেট্রয়েটের এক বক্তৃতায় তিনি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০ টাকা পাইয়াছিলেন। অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে একটিতে এক ঘণ্টায় ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে ২০০ ডলার মাত্র পাইয়াছিলেন। কারণ তাহাকে এক জুয়াচোর বদমায়েস বক্তৃতা কোম্পানী ঠকাইয়াছিল। পরে তিনি বক্তৃতা কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

স্বামীজীর শিবানন্দ স্বামীকে পত্র লেখা—স্বামীজী আমেরিকায় অনবরত কাজ করাতে তাঁহার কাজের ভাব খুব জাগ্রত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সকলকে কাজে প্রণোদিত করিবার জন্য তিনি অনবরত পত্র লিখিতে লাগিলেন এবং আলমবাজার মঠে শিবানন্দ স্বামীকে

একখানি উত্তেজনাপূর্ণ পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে তাঁহাকে আমেরিকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রেলে করিয়া অনবরত ঘুরিয়া বেড়াতে হইতেছে। অনেক সময় রেল গাড়িতেই আহার নিদ্রা চলিতেছে। কার্যের কোন বিরাম নাই। দিবারাত্র কার্য করিতে হইতেছে। পূর্ব হইতেই বক্তৃতা দিবার স্থান ও সময় সমস্ত নির্ধারিত হইয়া থাকে। তিনি শুধু রেল হইতে নামিয়া তথায় যাইয়া বক্তৃতা দিয়া পুনরায় অন্য এক স্থানে বক্তৃতা দিবার জন্য ট্রেনে করিয়া গমন করেন। বক্তৃতার বিরাম নাই। আহার করিবার, শয়ন করিবার বা বিশ্রাম করিবার সময় পর্যন্ত ঠিক নাই। একশ লোকের কাজ একা করিতে হয়। শক্তি যেন খুলিয়া যাইতেছে। শিবানন্দ স্বামী যেন ম্যাপ, গ্লোব, ছায়াচিত্রের যন্ত্র লইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরিয়া গ্রামে গ্রামে গরীব দুঃখীদের বিদ্যাচর্চা দিবার কাজ আরম্ভ করে এখন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই ইত্যাদি। এই পত্রখানি পড়িয়া সকলের ভিতর একটা ভাবের পরিবর্তন আসিয়া যাইল এবং সকলে মিলিয়া একদিন বসিয়া কিরূপভাবে কার্য করিতে হইবে তাহারই কথা হইতে লাগিল।

ব্রহ্মবাদিন, প্রবুদ্ধ ভারত ও উদ্বোধন পত্রিকা—স্বামীজী মাদ্রাজে আলাসিঙ্গাকে পত্র লেখেন যে তাহারা যেন শীঘ্র একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র বাহির করে এবং তজ্জন্য স্বামীজী অর্থ সাহায্য করিবেন। কিছুদিন বাদে মাদ্রাজ হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর শনিবার ১৮৯৫ খৃঃ 'ব্রহ্মবাদিন' নামক পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হইল। উহা M. C. Alasinga Perumal দ্বারা প্রকাশিত হয়। আলাসিঙ্গা, কিডি প্রভৃতি ইহার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিল। কিডির মৃত্যুর পর 'প্রবুদ্ধ ভারত' হিমালয়ের আলমোড়া হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে এবং বর্তমানে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

গুপ্তমহারাজ হিন্দি ও উর্দু ভাষা জানিতেন। শরৎ মহারাজ প্রস্তাব করিলেন যে হিন্দি বা উর্দুতে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে হইবে এবং গুপ্ত মহারাজ তাহার সম্পাদক হইবেন সারদা-

মহারাজ ইংরাজী বা বাঙ্গালাতে একখানি পত্র বাহির করুন। এইরূপে আপন আপন শক্তি অনুযায়ী সকলেই কম বেশী কার্য করিতে প্রণোদিত হইলেন। কিন্তু তখন কোন পত্রই প্রকাশিত হয় নাই; কয়েক বছর পরে সারদামহারাজের চেষ্টায় বাঙ্গলায় 'উদ্বোধন' পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহা অদ্যাপিও প্রকাশিত হইতেছে।

আলমবাজার মঠে সকলের নিমন্ত্রণ ও স্বামীজীর পত্র পাঠ করা—স্বামীজী আলমবাজাব মঠে একখানি পত্রে লেখেন যে, বাঙ্গালা দেশে যত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও যেখানে যেখানে যত অন্যান্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে তাহাদের সকলকে একত্রিত কবিয়া সমষ্টি হিন্দুসঙ্ঘ কব। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত যেখানে আছেন, ও যে যে ভাবের সাধক হউন না কেন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া এক উদ্দেশ্যে যেন চলেন। কাঁকুড়গাছির সহিত যেন সকলে মিলিয়া যায় এবং সামান্যেব জন্য কার্যে বাধা না হয়। পত্রখানি সুদীর্ঘ ও উত্তেজনা পূর্ণ ছিল। এই পত্রের উদ্দেশ্যানুযায়ী একদিন রবিবার আলমবাজার মঠে সকলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। প্রথমে বোম্বাইয়ের কালীপদ ঘোষ (দানাকালী) আসিলেন এবং পরে অনেকেই আসিয়া স্বামীজী প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং সকলের ভিতর কাজ করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হইল। সকলেরই ভিতর একটি ভাবের পরিবর্তন হইয়া যাইল। প্রত্যেকেই নিজের শক্তি ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতে তৎপর হইলেন কিন্তু অনভ্যস্ত থাকায় কাজ করিতে গিয়া অনেকে অধিক মাত্রা করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

স্বামীজীর Lord কথাতে আপত্তি—হরমোহন মিত্র যে প্যাম্‌ফ্লেট-খানি বাহির করিয়াছিল এবং স্বামীজীকে পাঠাইয়া দিয়াছিল তাহাতে Lord Ramakrishna লেখা ছিল। স্বামীজী Lord কথাটিতে বিশেষ বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ফিরিঙ্গিয়ানা ভাব কেন ঢোকাচ্ছ? কেন, আর কোন কি শব্দ ছিল না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই হচ্ছে চলিত কথা,

বরাবর এই শব্দ চলে আসছে।" তদবধি Lord কথাটি উঠিয়া গিয়া ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

সাধারণের পত্রে ইংরাজী ভাষায় Yours truly বা Yours এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। স্বামীজী কিন্তু সেই শব্দটি পরিত্যাগ করিয়া Yours in the Lord শব্দটি ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং তদবধি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভিতর এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

স্বামীজী আমেরিকা হইতে তাঁহার দাঁড়ান ফটো পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। শরৎমহারাজ সেই ফটো এক টাকা করিয়া বিক্রয় করিতে আদেশ করেন। এক টাকা করিয়া দাম হওয়ায় শীঘ্রই ফটোগুলি বিক্রয় হইয়া যায়। স্বামীজীর ফটো বাঙ্গালা দেশে এই প্রথম বিক্রয় হয়, ইহার পূর্বে হয় নাই।

জনৈক জার্মান অধ্যাপকের দক্ষিণেশ্বরে আগমন—একজন বৃদ্ধ জার্মান অধ্যাপক জার্মান রাজ সরকার হইতে প্রেরিত হইয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার জন্য কলিকাতায় আসেন। তিনি উত্তরপাড়ায় মুখুজ্জেদের লাইব্রেরীতে থাকিতেন। উৎসবের দিন বেলা তিনটার সময় তিনি কালী মন্দিরে আসিলেন এবং টুপি খুলিয়া শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেবের ঘরে বসিয়া ভক্তিভাবে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং ভক্তি করিয়া ফল প্রসাদ আহার করিলেন। তাহার নামটি এক্ষণে স্মরণ নাই তাঁহার শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া রহিল।

স্বামীজী আমেরিকায় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা কলিকাতায় আসিলে হরমোহন মিত্র সেইটি ছাপাইয়া বিক্রয় করিবার মনস্থ করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে স্বামীজী বাঙ্গালী, ইংরাজী ভাষায় তেমন অভিজ্ঞ নন। সম্ভবতঃ ভাষাতে অনেক ভুল হইয়াছে তাই তিনি সেইটি সংশোধন করাইবার জন্য তদানীন্তন 'ডেলী নিউজ' এর সম্পাদক ডাঃ ডেলীর নিকট লইয়া যান এবং কথা হয় যে তিনি ১০'০০ টাকা লইয়া বক্তৃতাটি সংশোধন করিয়া দিবেন। ডাঃ ডেলী ১০'০০ টাকা লইয়া কিছুই করেন নাই শুধু স্থানে স্থানে কমা

বসাইয়া দিয়াছিলেন—কিছু ত করা চাই! তিনি হরমোহন মিত্রকে বলিলেন যে ইহার পরিবর্তন করিবার কোন আবশ্যক নাই, ভাষায় কোন দোষ নাই, বরং অতি সুন্দর ভাষা হইয়াছে। এই কথা জানিতে পারিয়া সকলেই হরমোহন মিত্রকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। যাহা হউক হরমোহন মিত্র বক্তৃতাটি ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে লাগিলেন কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হয় নাই।

হেভবিতর্ণ ধর্মপাল—হেভবিতর্ণ ধর্মপাল চিকাগো ধর্মসভায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন। বক্তৃতাকালে স্বামীজীর সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্যতা হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বেশ কৃতজ্ঞতা-ভাব ছিল। জাপান ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া পর বৎসর গরমকালে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং স্বামীজীর অদ্ভুত প্রভাব, বক্তৃতার কৌশল, আকর্ষণী শক্তি ও অলক্ষিতভাবে জন-সাধারণের উপর প্রভাব ইত্যাদির বিষয় তিনি নানা প্রকারে বলিতে লাগিলেন। সংবাদপত্রে ও পত্রাদিতে যাহা কিছু প্রকাশ হইয়াছিল সেই সকল অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎস্থানের ও তদানীন্তনকালের উপস্থিত ব্যক্তির মুখের কথা শুনিয়া সকলেই হর্ষিত ও আনন্দিত হইলেন। মিনার্ভাথিয়েটার তখন তৈয়ারি হইয়াছে, ধর্মপাল একদিন সন্ধ্যার সময় তথায় স্বামীজীর বিষয় বক্তৃতা দিলেন এবং বহুলোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। ধর্মপাল বক্তৃতা-কালে বলিয়াছিলেন যে, কাগজে স্বামীজীর প্রতিকৃতি ছাপিয়া চিকাগোর রাস্তায় রাস্তায় মারিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ১১ই সেপ্টেম্বর একটি শুভদিন বলিয়া পঞ্জিকায় লিখিত হইয়াছিল। ধর্মপাল মুক্তকণ্ঠে স্বামীজীর সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজীর কি মস্তিষ্কশক্তি, কি হৃদয়গ্রাহী ভাব, কি সকলের প্রতি স্নেহ ও অমায়িকতা এই সকল বিষয় নানাভাবে বলিতে লাগিলেন। স্বামীজীর শক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, চুম্বক যেমন লোহা টানে সেই রকম তাঁহার শক্তি।

ধর্মপাল ও স্বামীজীর আলমবাজার মঠে আগমন—ধর্মপাল

এইরূপ বক্তৃতা করিবার পর সিমলা স্ট্রীটে সুরেশচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে একদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করান হইয়াছিল এবং সকলে বসিয়া তাঁহার নিকট হইতে স্বামীজীর কথা শুনিতে লাগিলেন। কিছু দিন পর আলমবাজার মঠে ধর্মপালকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার সহিত কোকামী নামক একজন জাপানীও গিয়াছিলেন। গরমকালে উভয়েই বড় ঘরের সামনের বারান্দায় শুইয়া রাত্রি কাটাইলেন এবং স্বামীজী ও চিকাগোর ধর্ম মহাসভার বিষয় অনেক কথা হইতে লাগিলেন।

ধর্মপাল ও অভেদানন্দ স্বামী—সেই সময় দক্ষিণেশ্বরের উৎসব খুব ধুমধামের সহিত হইতেছিল। ধর্মপাল উৎসব দেখিতে গিয়া কালীবেদান্তীর সহিত সর্বত্র দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, "Give them spiritual food" অর্থাৎ উহাদিগকে আধ্যাত্মিক খাদ্য দাও। এই কথাটি বারংবার বলায় কালীবেদান্তী একটু বিরক্তি ও হাস্য সহকারে বলিলেন, "শুধু কি দাঁড়িয়ে লেক্‌চার করলে spiritual হয়? এই যে লোক সকল আনন্দে প্রসাদ পাচ্ছে, কীর্তন করিয়া বেড়াইতেছে, ঠাকুরের ঘরে ও পঞ্চবটিতে প্রণাম করিতেছে, কেহবা জপ ধ্যান করিতেছে, কোথাও বা তাঁহার (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের) কথাবার্তা হইতেছে এগুলি কি spiritual food (আধ্যাত্মিক খাদ্য) নয়? দেখিতেছ না এত হাজার লোক মান মর্যাদা ভুলিয়া গিয়া সকলে কেমন পরস্পরের সহিত এক প্রাণে মিলিত হইতেছে এবং আনন্দে বিভোর হইয়া রহিতেছে এই হইতেছে আমাদের spiritual food, দাঁড়িয়ে কতকগুলো বক্তৃতা দিলেই spiritual food দেওয়া হয় না।" ধর্মপাল কালীবেদান্তীর কথা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তখন কালীবেদান্তী একটু শ্লেষ করিয়া ধর্মপালকে বলিলেন "তুমি একটা বক্তৃতা দাও না"। এই কথা বলিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইলেন।

বর্তমান লেখক ও অতুলচন্দ্র ঘোষ—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঘরের উত্তর-পূর্ব মুখে বাহির দিকের দরজার সম্মুখে বৃদ্ধ হাজরা মহাশয় এক আসন করিয়া বসিলেন। কম্বল, কুশাসন, মৃগচর্ম ইত্যাদির স্তূপ

আসন করিয়া খুব বড় একটি রুদ্রাক্ষের মালা লইয়া জপ করিতে বসিলেন। বৃদ্ধ হাজরা মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর বেশ হৃদ্যতা ছিল সেইজন্য বর্তমান লেখক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। কিন্তু অতুলবাবু তাহাতে বড় রাগিয়া যাইয়া বলিলেন, "তুই শ্যালা ওকে নমস্কার কল্লি কেন? এত খাতির কচ্ছিস কেন?" বর্তমান লেখক বলিলেন, "স্বামীজীর সহিত হৃদ্যতা আছে সেইজন্য সম্মান করা আবশ্যক।" অতুলবাবু আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোর শ্যালার সব উল্টো, যত দুখ চেটে নিয়ে তোদের কারবার। ছাখ্ না তামাসা ছাখ্ হাজরা শ্যালা কি করে। শ্যালা মনে করেছে যে নরেনের আজকাল অনেক রাজা চেলা হয়েছে, ঢের সাহেব মেম চেলা হয়েছে তাই আসন জমিয়ে মালা নিয়ে বসলো, মনে কচ্ছে ঝম্ ঝম্ করে প্রণামি টাকা পড়বে। কিন্তু দেখছিস না এখন পর্যন্ত একটা পয়সাও পড়লো না। শ্যালা হাজরা এই আসন গুটিয়ে পালাবে।" তাহা শুনিয়া বর্তমান লেখক বলিল, "না, হাজরা মহাশয়কে এমন কথা বলা ঠিক নয়।" তিনি সৎলোক তিনি প্রণম্য লোক তাঁহাকে এমন কথা বলা ঠিক নয়।" অতুলবাবু বলিলেন, "যা শ্যালা যা একটু পরে তখন দেখবি।" প্রকৃতই তিনটে বাজিতে হাজরা মহাশয় আসন গুটাইয়া চলিয়া যাইলেন। এই হইল হাজরা মহাশয়ের সহিত বর্তমান লেখকের শেষ সাক্ষাৎ।

অভেদানন্দ স্বামীর স্বামীজীর প্যামফ্লেট ছাপন—নরেন্দ্রনাথ সেনের 'ইণ্ডিয়ানমিরার' সংবাদপত্রে স্বামীজীর পক্ষ সমর্থন করিয়া লেখা, ধর্মপালের বক্তৃতা বা পক্ষান্তরে কলিকাতার সমাজের নিকট স্বামীজীর আমেরিকায় মহা প্রতিপত্তি ও প্রভাবের বিষয় সাক্ষাৎ বলিয়া দেওয়া এবং কয়েকটি বক্তৃতা ও মাদ্রাজ এবং খেতড়ির রাজার অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর এই কয়েকটির সমষ্টি শক্তিতে কলিকাতা ও বঙ্গদেশে এক নূতন ভাব উঠিল। পূর্বকার বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার ভাব [illegible] হইয়াছিল এবং সকলেই স্বামীজীর অনুগত ও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিলেন। একজন হিন্দু বিদেশে গিয়া ফিরিঙ্গিদের

উপর বিজয়ী হইয়াছেন এইজন্য সকলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতে লাগিলেন এবং সনাতন হিন্দুধর্মের সার্থকতা ও জীবনী-শক্তি যে আছে ইহা সকলের প্রাণে উদ্ভূত হইয়া উঠিল। সহরময় বেশ একটা গমগমে ভাব হইয়া উঠিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলাদলির ভাব চলিয়া যাইয়া সকলে একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। এই সময় মাদ্রাজ অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরখানি একটি প্যাম্‌ফ্লেট করিয়া কালীবেদান্তীর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়। সংস্কৃত শ্লোকগুলি দেওয়ায় প্যামফ্লেটখানি খুব বিক্রয় হইতে লাগিল এবং সকলেই আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে লাগিলেন।

শ্রদ্ধেয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্বামীজীর প্রতি মন্তব্য—স্বামীজী যখন নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে ছিলেন, তখন তাঁহার প্রত্যেক বক্তৃতাটি হইতে নূতন ভাব ও নূতন বাণী বাহির হইতেছিল এবং আমেরিকার সংবাদপত্রে ও পণ্ডিতমণ্ডলীর ভিতর স্বামীজীর যখন খুব সুখ্যাতি হইতেছিল তখন বাঙ্গলা দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া যাইল। সকলেই নিজের নিজের মত প্রকাশ করিয়া স্বামীজীর পাণ্ডিত্য, ওজস্বিতা, নির্ভীক ভাব ও নিষ্ঠার প্রতি নানা মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু গিরীশবাবু বড় বড় বা সুদীর্ঘ প্রবন্ধে কোন মত প্রকাশ করিলেন না। তিনি নানা লোকের মুখের কথা শুনিয়া ও সংবাদ পত্রে স্বামীজীর সুখ্যাতি দেখিয়া একদিন আশ্চর্যান্বিত হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিয়াছিলেন, "ওহে এ হলো কি! এ যে miracle-এর দিন আবার ফিরে এলো; miracle বহু শতাব্দীর আগে হয়েছিল এখন যে miracle চোখের সামনে দেখছি। এ যে বুদ্ধি বিবেচনার উপর গেল। একি তর্ক যুক্তিতে হয়? একটা শক্তি পেছনে না দাঁড়ালে এ সব কাজ কি কেউ করতে পারে?" এই কথা বলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বরের দিকে মুখ করিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু অতি সামান্য কথায় তাঁহার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কথাটি এমন হৃদয়স্পর্শীভাবে বলিয়াছিলেন যে তাহা শুনিয়া সকলে

বলাবলি করিতে লাগিল যে একথা শুধু গিরিশবাবুর মুখ থেকেই বাহির হইতে পারে।

স্বামীজীর প্রতি বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য—যোগেনমহারাজের পিতা বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় বাঙ্গালা কাগজে ও লোকের মুখে স্বামীজীব সুখ্যাতি শুনিযাছিলেন। তিনি ইংরাজী জানিতেন না এবং বক্তৃতার বিষয কিছুই বুঝিতেন না কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন শিষ্য আমেরিকায় যাইয়া খুব বক্তৃতা করিতেছে এবং সকলে তাহাকে বিশেষ আদর যত্ন ও সম্মান করিতেছে এইটুকু মাত্র তিনি লোকেব মুখে শুনিয়াছিলেন। বৃদ্ধ চৌধুবী মহাশয় একদিন সকালবেলা আলমবাজার মঠে আসিযা ভিতব বাড়ির পূর্বদিকেব ছাদটিতে ক্ষিপ্রপদে পায়চারি করিতে লাগিলেন এবং উত্তেজিত হইযা ডান হাত নাড়িতে লাগিলেন ও মস্তক এদিক ওদিক সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটু স্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ওহে ভিটেশ্বর (শশীমহারাজ) এ হলো কি? এ নরেন যে সকলকে ছাপিয়ে উঠলো। এখন শঙ্কর, বুদ্ধেব দলে গেল আর সাধারণ লোকের হিসাবে রইলো না। ব্যাপারটা হলো কি, এঁ্যা এযে শঙ্কর, বৃদ্ধ আবার ফিরে এলো", এই বলিয়া তিনি খানিকক্ষণ মৌনভাবে রহিলেন আবার পরক্ষণে ঐ কথাই পুনঃপুনঃ আবৃত্তি কবিতে লাগিলেন। এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে আর কথা কহিতে পারিতেছিলেন না, আনন্দে তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় অল্প কথাতে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমেরিকার প্রথম খবর আসিবার কয়েক মাস পরে কালী-বেদান্তী কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমেরিকা হইতে চিকাগো পার্লা-মেণ্টের রিপোর্ট ও মারউইনমেরী স্নেস ও অপর কয়েকজন লিখিত ধর্ম সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নামক দুইখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া আনাইলেন। কলিকাতার কোন পুস্তকালয়ে উক্ত গ্রন্থ পাওয়া যাইত না সেইজন্য এই দুই খানি পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সকলেরই বিশেষ আগ্রহ হইল এবং অনেকেই এই গ্রন্থ দুইখানি পড়িতে

লাগিলেন। রিপোর্টখানি অদ্যাপি বেলুড় মঠের পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। কিন্তু অপর ছোট পুস্তকখানি খেতড়ির মহারাজের আদেশ অনুযায়ী মুনসী জগমোহনলাল চাহিয়া পাঠাইলে সেই পুস্তকখানি খেতড়িতে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পুস্তকখানি তথায় নষ্ট হইয়া যায়। পুস্তকখানি নষ্ট হইয়া যাওয়াতে কালীবেদান্তী একটু দুঃখিত হইয়াছিলেন।

শ্রীনিবাস সামান্যা আয়ার—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গরমিকালে মাদ্রাজ হইতে শ্রীনিবাস সামান্যা আয়ার নামক একটি যুবক আলমবাজার মঠে আসিল। যুবকটি আলাসিঙ্গা প্রভৃতির বন্ধু ও স্বামীজীর বিশেষ অনুরক্ত ছিল। যুবকটির পিতা মহীশূরের রাজ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। শ্রীনিবাস সামান্যা আয়ার আসিয়া যদিও আলমবাজার মঠে রহিল কিন্তু সে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া অনবরত জপ করিত, এমন কি অনেক সময় তাহাকে আহার করাইবার জন্য লোক পাঠাইয়া সন্ধান করিয়া আনাইতে হইত। হঠাৎ তাহার বৈরাগ্যভাব আসিয়াছিল। যুবকটি উচ্চ শিক্ষিত ও আচার ব্যবহার ঘরওয়ানা ঘরের ছেলের মত প্রকাশ পাইত কিন্তু নিজে কোন আত্মপরিচয় দিতনা। আলাসিঙ্গা সেই সময় পত্র লিখিল এবং টেলিগ্রাম করিল যে সামান্যা যদি মঠে যায় তা'হলে তাহাকে যেন সেই স্থানে বেশ যত্ন করিয়া রাখা হয় এবং অন্যত্র সে যেন চলিয়া না যায়। ১৫/২০ দিন আন্দাজ সে মঠে ছিল ও তাহার প্রতি সকলের কেমন একটা ভাল ধারণা হইয়াছিল।

বেলগিরি আয়েঙ্গারের মঠে আগমন—কিছুদিন পরে বেলগিরি আয়েঙ্গার তিন চারিটি লোক লইয়া সামান্যা আয়ারের অন্বেষণে আলমবাজার মঠে আসিলেন এবং তাহাকে দেখিতে পাইয়া সুস্থ হইয়া তাঁহারাও পাঁচ ছয় দিন মঠে রহিলেন। বেলগিরি স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। অবশেষে সামান্যা আয়ারের পরিচয় দিয়া তাহাকে দেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন। বেলগিরি আয়েঙ্গার নিজের দেশে শুনিয়া ছিলেন যে বাঙ্গালা দেশে নবদ্বীপে

খুব ন্যায়ের চর্চা হইয়া থাকে কিন্তু এ সময়ে পূর্বের ন্যায় ন্যায়ের চর্চা হইয়া থাকে কি না জানিবার জন্য তিনি নবদ্বীপে যাইতে মনস্থ করিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নবদ্বীপে গিয়াছিলেন, কারণ তিনি কয়েকবার বলিয়াছিলেন যে দেশে ফিরিয়া গিয়া মাদ্রাজ হইতে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য নবদ্বীপে ছাত্র পাঠাইবেন কিন্তু তাহাবপর সে সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হয় নাই।

অবশেষে সকলে মাদ্রাজে ফিরিয়া যাইল। সামান্যা আয়াবেব সহিত গুপ্তমহারাজের বিশেষ সৌহার্দ হইয়াছিল এবং একদিন আলীপুরের চিড়িয়াখানাও দেখিতে গিয়াছিলেন। আলীপুরের চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়া গুপ্তমহারাজ একটি পুকুরের ধাবে গাছের তলায় ঘাসের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িয়া বর্তমান লেখককে বলিতে লাগিলেন, "চাচা, এমনি নিরাশ্রয় ও নিঃসঙ্গ হইয়া যেন একটা গাছের তলায় শুইয়া মরি। আমার জীবনের এই একটা বিশেষ আকাঙ্ক্ষা।" বর্তমান লেখক এই কথা শুনিয়া একটু বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "দূঃ, তোর অমন ইচ্ছে কিরে, এত হীন ভাবের কথা বলিস কেন?" গুপ্তমহারাজের যখন খুব অসুখ এবং নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন তখন এই কথাটি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট জনৈক রাজপুত সর্দারের আশীর্বাদ চাওয়া—রাজপুতানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাখালমহারাজ এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। এক বিশিষ্ট রাজপুতের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হয়। রাজপুত সর্দার একদিন বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া রাখালমহারাজকে বলিলেন, "মহারাজ আমায় আশীর্বাদ করুন যেন আমার যুদ্ধে মৃত্যু হয়। আমার পিতার আমার মত অকর্মণ্য সন্তান আর কেহ হয় নাই। আমাদের বংশে সকলেই লড়াইয়ে আহত বা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে কিন্তু আমার এত বয়স হইয়াছে এখনও আমার দেহে তলোয়ারের চোটের দাগ নাই, আমি লোকের কাছে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হই। আপনি আশীর্বাদ করুন যাহাতে আমার লড়াইয়ে মৃত্যু হয় এবং আমার বদনাম অপনীত হয়।"

রাখালমহারাজ ত রাজপুত সর্দারের আশীর্বাদ চাইবার ধরণ দেখিয়া অবাক! অর্থ, ঐশ্বর্য, মান, যশ এ সব তাহার নিকট তুচ্ছ-পদার্থ কিন্তু যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিতে পারাই তাহার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা। আর একদিন রাখালমহারাজ সেই সর্দারের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতে বসিয়াছেন। সর্দার অতিশয় শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া রাখালমহারাজকে আহার করাইতেছেন। সহসা সর্দার অতিশয় আনন্দিত হইয়া ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "শূয়ার কা আচার লে অ্যাও" অর্থাৎ শূকরের আচার রাখালমহারাজকে খাওয়াবেন। রাজপুতদিগের ইহা একটি পরম উপাদেয় বস্তু। সর্দারের কথা শুনিয়াই ত রাখালমহারাজের প্রাণ অ্যাঁৎকিয়ে উঠিল; তিনি কোন রকমে ওজর আপত্তি দেখাইয়া শূকরের আচার দিবার পূর্বে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন।

স্বামীজীর ভারতীয় দ্রব্য চাহিয়া পাঠান—১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে গরমি-কালে স্বামীজী সান্ন্যালমহাশয় প্রভৃতিকে একখানি পত্রে লেখেন যে তিনি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করা অবধি ভারতীয় দ্রব্য আহার করিতে পান নাই অর্থাৎ ডাল, বড়ী, আমতেল, আচার ইত্যাদি। বিদেশী রান্না খাইয়া একেবারে অরুচি হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী লঙ্কার ঝাল ও টক খুব খাইতে পারিতেন কিন্তু চিনি একেবারেই খাইতে পারিতেন না। এইজন্য সান্ন্যাল মহাশয় কয়েক প্রকার ডাল, বড়ী, আমতেল, আচার প্রভৃতি যোগাড় করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। জাহাজে করিয়া জিনিসক'টি পৌঁছিতে অবশ্য দুই মাস আড়াই মাস দেরী হইয়াছিল। ভারতীয় দ্রব্য পাইয়া স্বামীজী মহাআনন্দিত। তিনি নিজে রন্ধন করিতেন ও মহাআনন্দ করিয়া খাইতেন এবং গুড্‌উইনকেও একটু একটু খাইতে দিতেন। আমতেল ও বড়ী খাইয়া গুড্‌উইন একেবারে মুখ বিকৃত করিয়া উঠিয়াছিল। লণ্ডন অবস্থানকালে গুড্‌উইন একদিন বলিল, "স্বামীজীর কি খেয়াল হল ভারতবর্ষ হতে কি কতকগুলি বদ জিনিস (nasty stuff) আনালেন। কি দুর্গন্ধ ও কি বদ রকম খেতে। মুখময় ও জিহ্বায় তেলে লেপে

যায় সেটা মুখে দিয়ে আমার বমি আসতে লাগলো। কিন্তু স্বামীজী খুব আহ্লাদ করে খেতেন আর অনেক দূরদেশ থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে বলে আমি সেগুলি ওঁজলার ডাবাতে ফেলতুম না। এমন দুর্গন্ধ জিনিস কেউ কখন খায়।" স্বামীজী এই কথা শুনিয়া বিদ্রূপ-চ্ছলে বলিলেন, "আরে গুড্‌উইন তোদের পোনিরকেও আমাদের দেশে ঐ কথা বলে, কি দুর্গন্ধ জিনিস। আর সাত দিনের বাসি রান্না একটু গরম করে তোরাও খাস আর টিনে করা মাছ মাংসও খাস।" যাহা হউক নিজের দেশের অতি তুচ্ছ জিনিসও বিদেশে অতি অপূর্ব ও আশ্চর্য বলিয়া বোধ হয়।

স্বামীজীর খেতড়ির রাজাকে পত্র লেখা—এই সময় খেতড়ির রাজা অজিত সিং-এর সহিত স্বামীজীর সর্বদা লেখা চলিত। চিঠিগুলিতে জাপানের উদ্যমশীলতা ও শিল্পনৈপুণ্যের ও কার্যানুরাগের বিষয় অনেক কথা লেখা থাকিত। রাজাসাহেবকে বিদেশে যাইয়া তাহাদের হাবভাব দেখিয়া যাইবার জন্য অনুরোধও থাকিত। অনেক বিষয় জানিবার ও শিখিবার ছিল। মুন্‌সী জগমোহনলাল স্বামীজীর তিনখানি পত্র নকল করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং অপর পত্রগুলির মর্মার্থ লিখিয়া মাঝে মাঝে কলিকাতায় পাঠাইতেন তাহাতে চিঠিগুলির মোটামুটি ভাব বুঝিতে পারা যাইত। সে পত্রগুলি পাইবার আর কোন আশা নাই।

আলমবাজার মঠে সকলের পত্র নষ্ট হইয়া যাওয়া—আলমবাজার মঠে বড় ঘরটির পূর্বদিকের কোণে একটি ফাইলে অনেকগুলি চিঠি ছিল। সারদামহারাজ তিব্বত যাত্রাকালে আস্‌কট্‌ হইতে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, কালীবেদান্তী রাজপুতানা ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন এবং অন্যান্য অনেকেরও পত্রাদি ছিল। সেই সকল পত্র পাঠ করিলে অনেক দেশের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয় জানিতে ও শিক্ষা করিতে পারা যাইত। সেই সকল পত্রের সার্থকতা কেহই তখন বুঝিতে পারেন নাই এবং পত্রগুলি অধিক হওয়ায় কথিত আছে নিরঞ্জন

মহারাজ সেইগুলি পুড়াইয়া ফেলেন। সেই পত্রগুলি এক্ষণে থাকিলে অনেকের বিশেষ উপকারে আসিত, কারণ প্রথম উদ্যমে সকলেই নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সব স্থানের বিশেষ জিনিস, পত্রাদিতে লিখিয়া পাঠাইতেন। সেই সকল পত্রে নানা বিষয়ের বর্ণনা ছিল।

লাটুমহারাজ এই সময় স্বামীজীকে একখানি পত্র লেখেন। পত্রের কিছু অর্থ ছিল না কিন্তু স্বামীজীর প্রতি যে লাটুমহারাজের বিশেষ আন্তরিকতা ও ভালবাসা ছিল সেইটি তিনি পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। লাটুমহারাজ পত্রে স্বামীজীব নিকট হইতে একটি পাগড়ী চাহিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন একটি জিনিস চাহিয়া স্মৃতির স্বরূপ মস্তকে ধারণ করিবেন। স্বামীজীও লাটুমহারাজের পত্রের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া অতি আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন "এ দেশে পাগড়ী পাওয়া যায় না। তুমি কলিকাতা হইতে কিনিয়া লও, যাহা আবশ্যক হইবে তাহা আমি পাঠাইয়া দিতেছি।"

আলমবাজার মঠে স্বামীজীর পত্র লেখা—এই সময় প্রত্যেক সপ্তাহে পত্র আসিতে লাগিল। আমেরিকায় কি কার্য হইতেছিল তাহার অনেক বিবরণ থাকিত এবং ভারতবর্ষে কি কার্য করা আবশ্যক সে বিষয়েও সমস্ত উপদেশ থাকিত। অর্থাৎ স্বামীজী আমেরিকায় বসিয়া দুই দেশের কার্য চালাইতে লাগিলেন। একটি পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন, "ওরে, লিডার (নায়ক) কি গড়ে পিটে হয়— লিডার জন্মায়।" যাহা হউক নানা প্রকার উৎসাহ ও উত্তেজনাপূর্ণ পত্র আসিতে লাগিল। এদিকে আলমবাজার মঠে ভক্তমণ্ডলীর সংখ্যাও খুব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সকলেই একপ্রাণ ও একমন এক উদ্দেশ্য লইয়া কার্য করিতে লাগিল। সকলেরই ভিতর আনন্দ ও উৎসাহ আসিতে লাগিল। পূর্বে যেমন নিভৃতস্থানে বসিয়া একান্তমনে সকলে জপ-ধ্যান করিবার প্রবৃত্তি ছিল এক্ষণে সে ভাব হ্রাস হইয়া গেল।

এক্ষণে কি করিয়া শক্তি বিকাশ করা যায় তাহারই আবশ্যক। শক্তি বিকাশ করিবার জন্য সকলেরই উৎসাহ আসিল। স্বামীজীও এই সময় এক উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিলেন। সেই পত্র পড়িয়া সকলের বুকে সিংহ বিক্রম আসিল। এই সময় অনেক অপবিচিত যুবক ভক্তমণ্ডলীর ভিতর আসিতে লাগিল। তুলসী মহাবাজ একদিন দুঃখ কবিয়া বলিতে লাগিলেন, "এই সময় যদি বলরাম বাবু ও সুবেশ বাবু জীবিত থাকিতেন তা'হলে তাঁহাদের কত আনন্দ হইত। বলবাম বাবু ও সুরেশ বাবু নিজের পরিধেয় কাপড় মাথায় বাঁধিয়া ধেই ধেই করিয়া নাচিতেন", অর্থাৎ আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন। তুলসীমহারাজ এমন প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বলিযাছিলেন যে সকলেই সেই কথা শুনিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন এবং সকলেরই মুখে কথা উঠিল যে বলরাম বাবু ও সু'রেশ বাবু থাকিলে আজ কি আনন্দই করিতেন! কিন্তু দুঃখেব বিষয তাঁহাবা এসব দেখিয়া যাইতে পাবেন নাই, এই জন্য সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর রামকৃষ্ণানন্দকে আমেরিকায় যাইবার জন্য পত্র লেখা— এই সময় আমেরিকায কার্য অতিশয বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্বামীজী একা অসমর্থ হইয়া উঠিলেন সেইজন্য উপযুক্ত সহকারী চাহিয়া পাঠাইলেন। শশীমহারাজকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান এবং শশীমহারাজ যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু শশীমহারাজের শবীর তখন অসুস্থ থাকায় সকলে স্থিব করিলেন যে কোন বিচক্ষণ ডাক্তারকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। ডাঃ স্যালজারকে এ বিষয জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অমত করেন এবং বলেন যে ওরূপ ঠাণ্ডা দেশে সর্বদা শরীর আবৃত করিয়া থাকিলে শশীমহারাজের শরীর খারাপ হইবে। তাহার পক্ষে গরম দেশে থাকা ভাল। অগত্যা, শশীমহারাজ যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন এবং শবৎ-মহারাজকে পাঠাইবার কথা স্থিব হইল।

স্বামী সারদানন্দের আমেরিকায় গমন—শরৎমহারাজ তখন বড় লাজুক ছিলেন এবং নিজে যে কোন বিশেষ কার্য করিতে পারেন

এরূপ আত্মনির্ভর ভাব তাঁহার ছিল না। কিন্তু স্বামীজীর অনুগত থাকায় যোগ্যতা অযোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি কিছু ভাবিলেন না। তিনি এরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে যদি যাইয়া কিছুই না করিতে পারি তাহলে তামাক সাজিয়া খাওয়াইয়া বা রাঁধিয়া খাওয়াইয়া সেবা করিতে ত পারিব। সময় মত ছুটো হাসির কথা কহিয়া বা বাঙ্গালায় কথা কহিয়া ত খুসী করিতে পারিব। লেকচার ফেকচার ত কিছু বুঝিনে। তিনি আদেশ করেন যাব, একবার সভায় গিয়ে দাঁড়াব, কিছু বলতে পারি ত ভাল না হয় একেবারে জাহাজে করে ফিরে এসে মঠে ঢুকব। আমি ত বাপু লেকচার ফেকচার কিছু জানি না, মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, লোটা কম্বলই আমার স্থির আছে তবে একবার যাওয়া যাকনা। সম্মুখে না হয় বকুনি গাল মন্দ খাব, সে ত আমার চিরকালই অভ্যাস আছে আর এটাতো আমার গা সওয়া আছে। শরৎমহারাজ এইরূপ ভাবে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। শরৎমহারাজের জন্য জামা, কলার ইত্যাদি তৈয়ারি হইল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে বি· আই· এস এন· কোম্পানীর 'রেওয়া' (Rewa) নামক জাহাজে করিয়া শরৎমহারাজ লণ্ডনে যান এবং পরে তথা হইতে তিনি আমেরিকায় গমন করেন। লণ্ডনে রেডিং নগরে ই· টি· ষ্টার্ডির বাটিতে শরৎমহারাজ রহিলেন এবং তথায় স্বামীজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

বর্ত্তমান লেখকের লণ্ডনে গমন—শরৎমহারাজের কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার এক সপ্তাহ পরে বর্ত্তমান লেখক আইন অধ্যয়ন করিবার জন্য লণ্ডনে গমন করেন কিন্তু আইন পড়িতে স্বামীজী নিষেধ করায় বর্ত্তমান লেখক অন্য বিষয় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। স্বামীজী বাচস্পত্যম অভিধান চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সেইজন্য সকলে মিলিয়া ১০০·০০ টাকা দিয়া অভিধানটি ক্রয় করিয়া বর্ত্তমান লেখকের সহিত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

লণ্ডনে স্বামীজীকে বহু বৎসরের পর দেখিয়া বর্ত্তমান লেখকের চিনিতে একটু বিলম্ব হইল। ইহার একটা বিশেষ কারণ এই যে·

কলিকাতা বা বাঙ্গলা দেশে যে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন সে লোক আর তখন নন, তিনি স্বতন্ত্র—অপর এক ব্যক্তি হইয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে নরেন্দ্রনাথকেই সকলে দেখিয়াছিল বিবেকানন্দকে কেহ দেখে নাই। স্বামী বিবেকানন্দ যে কে ছিলেন এবং কিরূপ শক্তিমান মহাপুরুষ তিনি ছিলেন তাহা ইউরোপ আমেরিকা দেখিয়াছিল। কারণ স্বামীজী যখন পুনরায় ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁহার সে শক্তি, সে তেজ স্বয়ংই আহরণ করিয়া শান্ত পুরাতন নরেন্দ্রনাথ হইয়া তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

ঘটনাবলীতে পারম্পর্যের কোন আবশ্যক নাই ; এইজন্য ইহাতে কোন দোষ হয় না। কথা প্রসঙ্গে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ভাব প্রস্ফুটিত করা এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি উপাখ্যান এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে কথোপকথন—আলমবাজার মঠে একদিন বৈকালবেলা হরিমহারাজ বাহির বাড়ির পশ্চিমদিকে দালানে বসিয়া আছেন এবং আশে পাশেও অনেক লোক বসিয়া আছে। অনেকেই হরিমহারাজকে নানা বিষয় প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হরিমহাবাজ স্থির ধীর ও মেরুদণ্ড উন্নত করিয়া গম্ভীর-ভাবে সকলকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ ব্রহ্মা কোন ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞান শিখাইয়াছিলেন ; কিন্তু ব্যক্তিটি অনুপযুক্ত অধিকারী, সে ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া শক্তি অপব্যয় করিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহাকে অধীত বিদ্যা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। সেই ব্যক্তিটি বলিল, 'বিদ্যা কি করে প্রত্যর্পণ করা যায়?' ব্রহ্মা বলিলেন, 'তুমি বিদ্যা বমন করিয়া ফেল।' সে তদ্রূপই করিল এবং ব্রহ্মা তিতিরপক্ষী হইয়া সেই বমন গ্রহণ করিয়া লইলেন। তদ্রূপ হইলে সেই ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান বিনষ্ট হইল এবং সে সাধারণ লোকের মত হইয়া যাইল। উচ্চ ভাবের কথা সকলকে দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু উপযুক্ত অধিকারী না হইলে তাহার ভিতর উচ্চ ভাব, পরিস্ফুট হয় না।"

তুরীয়ানন্দ স্বামীর উপনিষদের কথা বলা—তাহারপর উপনিষদের

অনেক কথা হইতে লাগিল। তিনি কঠোপনিষদ ও অন্যান্য উপনিষদ হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট বাণী সকল উদ্ধৃত করিয়া অতি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী ভাবে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকল ব্যক্তি যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন। হরিমহারাজ সাধারণ ভাবের লোকের মত কথা কহিতেছিলেন কিন্তু উপনিষদের কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ভাব সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তিত হইয়া যাইল। মুখ, চক্ষের জ্যোতিঃ, কণ্ঠস্বর বিভিন্ন প্রকার হইল। তিনি যে খুব উচ্চ অবস্থার লোক সেই ভাব বা সেই শক্তি যেন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও কণ্ঠস্বর দিয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি হইয়া যাইলেন শান্তিপূর্ণ গম্ভীর নিশ্চল পুরুষ। কখন বা তিনি উপনিষদের কথা বলিতেছেন ও আবৃত্তি করিতেছেন কখন বা স্থির নির্বাকভাবে বিভোর হইয়া যাইতেছেন, মন যেন দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য এক উচ্চভূমিতে চলিয়া যাইতেছে। একেবারে তিনি যেন ধ্যানস্থ হইয়া যাইতেছেন। নিকটস্থ সকল লোক স্তম্ভিত হইয়া হরিমহারাজের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। হরি-মহারাজের ভাব, মুখভঙ্গি ও কথাবার্তা সকল এরূপ উচ্চ অবস্থার হইয়াছিল যে সকলেই স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন যে, প্রাচীন-কালে ঋষিরা তপোবনে বসিয়া কিরূপভাবে উপনিষদ ও ব্রহ্মজ্ঞান শিষ্যমণ্ডলীকে বুঝাইয়াছিলেন। ঋষির তপোবনের একটা ছবি সকলে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। হরিমহারাজ সেদিন নিজের ভাব, নিজের মুখভঙ্গি ও নেত্রের ধ্যানস্থ ভাব দিয়া প্রকাশ করিয়া-ছিলেন।

অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি বলিলেন সে সমগ্র উপনিষদ্ তাঁহার কণ্ঠস্থ এবং উপনিষদের নানা স্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন। যাহা হউক হরিমহারাজের কথাবার্তা ও ভাব-ভঙ্গিতে সেদিন অনেকের আনন্দ হইয়াছিল এবং ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ কিরূপ হয় সকলে তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর স্বামীজীর সম্বন্ধে গল্প বলা—সকালে বাহির

বাড়ির বড় ঘরটিতে বসিয়া অনেকে চা পান করিতেছিলেন এবং কয়েকজন লোকও আশেপাশে বসিয়াছিলেন। তখন স্বামীজী দক্ষিণ ভারতে বা সমুদ্রযাত্রা কবিয়াছিলেন। যাহা হউক হরিমহাবাজ স্বামীজীর কথা চা পান করিতে করিতে তুলিলেন। হরিমহারাজ বলিতে লাগিলেন, "দেখ নরেনের সব কাজ কি চট্‌পটে, পাগড়ী বাঁধবে তাও কি চট্‌পট্ করে। অপবের পাগড়ী বাঁধতে কত আবসি দরকার করে, সাত বাব করে মুখ দেখছে ঠিক পাগড়ী হল কিনা। কিন্তু নরেন কাপড়খানা নিলে ও নিমেষের মধ্যে মাথায় পাগড়ী বাঁধলে ; একটু দোষ বা বেমানান হল না", এই বলিয়া তিনি যেন নিজেই নরেন্দ্রনাথের অনুকরণ কবিয়া হাত দিয়া নিজের মাথায় পাগড়ী বাঁধিতে লাগিলেন। নরেনের সব কাজ চট্‌পটে, পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন। তখন হরিমহারাজ নবেন্দ্রনাথের ভাবে পরিপূর্ণ হইযা-ছিলেন। ঠিক যেন সম্মুখে তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তখন আব উপনিষদের ধ্যানস্থ ভাব ছিল না ; চট্‌পটে মহাকর্মী লোক হইযা উঠিলেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন, "অন্য লোক এক ঘণ্টায় যে কাজ করবে নরেন তুই মিনিটে সে কাজ করে ফেলে এবং এক সঙ্গে পাঁচ ছয়টা কাজ করে যায়। নরেনের মন এত তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী যে একটা কাজে মনটিকে স্পর্শ করাচ্ছে মাত্র এবং তখনই সে কাজটা সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ; এমন লোক জগতে খুব কম আছে। আলুর খোসা ছাড়ান দেখ, কুটনো কোটা দেখ, পাঁচ মিনিটে সব কুটনো কুটে ফেললে। আলুর খোসা ছাড়ান দেখ, আলুকে আঙ্গুল দিয়ে ধরলে বঁটির গায়ে ছুঁয়াতে লাগল আর ঠিক খোসাটি উঠে গেল। আলুটা কোন জায়গায় বেঁধে গেল না বা চোকলা উঠে গেল না। কি আশ্চর্য তার কাজকর্ম ! সব বিষয় যেন চন্‌মন্ করছে, এই কুটনো কুটছে, এই হাসি তামাসা করছে, এই দর্শনের কথা বলছে কোনটাই যেন তার পক্ষে কিছুই নয়। আর জান হে, নরেনের মুখখানি নয়ত, খুরখানি। মাথার যেখানে ধরবে সেখান থেকে একটা চাকলা উঠিয়ে

নেবে। যে কথাই যে তুলুক না কেন নরেন এমন তার জবাব দেবে যে তার উত্তর করবার আর কিছুই থাকবে না। আর মুখের উপর এমন জবাব করতে পারে যে, লোকটা যত বড়ই হউক না কেন তাকে কেঁচো কেঁচো করে দেবে।

জনৈক ব্যক্তিকে নরেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ করা—"মিরাট অঞ্চলে একবার একজন লোকের বাড়ি যাওয়া গেল, লোকটির ঢের টাকা কিন্তু মহাকুঞ্জুস। প্রথম দিন একথা ওকথা হল। লোকটি ভারি ছুনিয়াদার। বৈঠকখানায় অনেক লোক আছে, নরেন তার উপর চটে গেল। সকলের সম্মুখে তাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'হ্যাঁ গা, তোমাকে সকলে নন্দগাঁটা বলে কেন গা?' লোকটা তার অবজ্ঞা-সূচক নাম সাধুর মুখে শুনে বড় বড় কথাবার্তা ছেড়ে কেঁচো হয়ে রইল। তারপর নরেন ত তাকে Volly fire করতে লাগল, ধমকানি খানিকক্ষণ দিয়ে তারপর হেঁসে তাকে বেশ খুসী করে দিলে। আসবার সময় বললে, 'ওহে তোমার নাকি ভাল তামাক আছে, খানিকটা তামাক দাও দেখি।' সে তাড়াতাড়ি উঠে খানিকটা তামাক দিল। তামাক নিয়ে চলে আসা গেল; একসঙ্গে ধমকাতে, রাগাতে, হাসাতে, ভালবাসা দিয়ে আপনার করে নিতে খুব কম লোককে দেখতে পাওয়া যায়।

"একবার এক জায়গায় একজন লোক বড় জাতিবিচারের কথা বলছিল। এক জাতেরই নানা প্রকার গুণ ব্যাখ্যা করছিল। নরেন চুপ করে বসে শুনছিল, আর থাকতে পারলে না। তার উপর ঠাট্টা স্থুরু করলো, 'ওহে তোমাদের ত কাঁচা জাত একটু ছুঁয়ে দিলেই জাত যায়; আমাদের কি জান—পাকা জাত, উনসত্তিক লোক ছুঁলেও আমাদের জাত যায় না। আর তোমাদের ছোঁবার আগেই জাত গিয়েছে। আমাদের সাধুদের পাকা জাত, ছুঁলে কিছু হয় না বরং তাকে সে জাতে করে নেওয়া যায়", এই বলিয়া হরিমহারাজ পাকা জাত কাঁচা জাত সম্বন্ধে অনেক মুখভঙ্গি ও হাস্যজনক স্বর করিয়া

হাসি তামাসা করিতে লাগিলেন। সেইদিন সকালে হরিমহারাজের বেশ প্রফুল্ল মন ছিল সেইজন্য অনেক হাসি তামাসা করিতে লাগিলেন।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর কুটনো কুটা—হরিমহারাজ যদিও সাধু হইয়া পশ্চিম ও উত্তরাখণ্ডে অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং ভ্রমণকালে ধ্যান ও তপস্যা এই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল কিন্তু বহুদিনের পর আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেও তাঁহার কুটনো কুটা অভ্যাস ঠিক ছিল। তিনি অতি সুন্দরভাবে কুটনো কুটিতে পারিতেন। মনটা উচ্চদিকে গেলেও চট্ করে তিনি সামান্য কাজে লাগাইতে পারিতেন। তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল, সকালে চা খাইবার সময় বা কুটনো কুটিবার সময় তাঁহার মনটা খুলিয়া যাইত এবং অনেক উচ্চ বিষয়ের কথা সে সময় তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত। তাঁহার কুটনো কুটার সময় একটা বিশেষ সময় বলে গণ্য হইত, কারণ সে সময় তিনি অনর্গল নানা উচ্চ কথা বলিতেন। কিন্তু সেজে গুজে বক্তৃতা দেওয়ার মত কষ্ট কল্পনা করিয়া তাঁহার মন খুলিত না। তাঁহার এইটি একটা বিশেষ লক্ষণ ছিল।

হরিদ্বারে এক সাধুর সহিত হরিমহারাজের সাক্ষাৎ হয়। একটু ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় হরিমহারাজ বাঙ্গালী সাধুর কথা তুলিলেন। সাধুটি নরেন্দ্রনাথের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "এত সাধুর সহিত মিশেছি কিন্তু অমুকের ন্যায় অর্থাৎ (নরেন্দ্রনাথের ন্যায়) সাধু কখন দেখি নাই। হাসাতে হাসাতে পেটে ব্যথা করে দিত আর হাসির সঙ্গে এমন কথা বলত যে একেবারে বৈরাগ্য আবার যেন জেগে উঠত। অমন ইয়ার সাধু জীবনে কখন আর দেখি নাই", এই বলিয়া হরিমহারাজের পরিচিত জ্ঞানে, তাঁহার নানা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, নরেন্দ্রনাথ তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। হরিমহারাজ এই কথাগুলি অতি আনন্দ ও কৌতুকের সহিত বলিতে লাগিলেন। কারণ সাধুটি নরেন্দ্রনাথকে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত ও আপনার লোক বলিয়া জানিত এই জন্য হরিমহারাজ বড় খুসি হইয়াছিলেন। গল্পটি

সামান্য হইলেও নরেন্দ্রনাথের প্রতি হরিমহারাজের কি ঐকান্তিক ভালবাসা ছিল তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

চৌধুরী মহাশয়ের রহস্য করা—রাত্রে ঠাকুরের প্রসাদি লুচি ও মিষ্টি যাহা থাকিত শশীমহারাজ প্রসাদস্বরূপ সকলের পাতে সামান্য মাত্র দিতেন এবং অধিকাংশ প্রাসাদ সকালের জন্য রাখিয়া দিতেন। সকালে যখন অনেকে চা খাইতে বসিতেন তখন শশীমহারাজ প্রসাদি লুচি ও মিষ্টি আনিয়া দিতেন। সকলে একটু একটু প্রসাদ মুখে দিয়া চা খাইতেন। চৌধুরী মহাশয় কৌতুক রহস্যের লোক; তিনি সকাল বেলা লুচি ও সন্দেশ দেখিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, "সকালবেলায় জল খাওয়া লুচি মণ্ডা এ ত মাথা কাটা তপস্যার ফল", তিনি এই ভাবে অনেক কৌতুক করিতেন।

চা মণ্ডলীর কথোপকথন—যাহা হউক চা খাইতে বসিলে কোন একটা উচ্চ বিষয়ের প্রশ্ন উঠিত। কালীবেদান্তী পড়াশুনার লোক। সে একটা কথা তুলিত এবং সকলে সেই কথা লইয়া নানা প্রকার চর্চা করিতেন। কোন্ কোন্ শাস্ত্রে সে বিষয়ে কি কি উল্লেখ করিয়াছে সকলে সেই বিষয় লইয়া নানা বাদানুবাদ করিতেন। কথাটা তখনি মীমাংসা না হইলেও সকলে নানা গ্রন্থ দেখিতেন এবং সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া পরদিন চায়ের সময় আবার সেই কথা তুলিতেন। চা পান করা একটা নিমিত্ত মাত্র; কিন্তু সকলে এক সঙ্গে মিলিত হইয়া উচ্চ ভাবে নানা কথাবার্তা বলা সে সময়েরই প্রধান অঙ্গ ছিল। দর্শনশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বিভিন্ন দেশের ধর্ম ইত্যাদির সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চর্চা হইত। সেই কথা যদি সমগ্র ভাবে লেখা থাকিত তাহা হইলে কয়েক খণ্ড নূতন প্রকার দর্শনশাস্ত্র লেখা হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সময়ের সকল কথা কাহারও স্মরণ নাই। বস্তুতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মণ্ডল যাহাকে বলে অর্থাৎ একজন বিশেষজ্ঞ ঋষি কিছু বলিতেছেন ও অপর সকলে তাঁহার নিকট বসিয়া নিবিষ্ট মনে শুনিতেছেন, পক্ষান্তরে সেই ভাবটি আসিত। তবে গুরুগিরি ভাব কিছু ছিল না। মাঝে মাঝে হাসি

তামাসা ঠাট্টাও খুব চলিত। একটা ভালবাসার স্রোতের উপর দিয়া জ্ঞান চর্চা খুব চলিতেছিল। এই চা-পানমণ্ডলী একটা বিশেষ স্মরণ রাখিবার কথা। এমন কি স্বামীজী ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে যে সব বক্তৃতা করিয়াছিলেন সংক্ষিপ্ত ভাবে অনেক কথা এই চা-মণ্ডলীতেই হইয়াছিল। এইটা ছিল চায়ের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত ঋষিসঙ্ঘ ও দর্শনশাস্ত্র-পীঠ।

কোন কোন দিন সকালবেলা কি কি কথাবার্তা হইয়াছিল এক্ষণে ঠিক স্মরণ নাই; কিন্তু চা-পান করিবার সময় সকালে যে কথাটা হইয়াছিল এইটা খুব স্মরণ আছে। চা-পান মণ্ডলীতে হরিমহারাজই কিছুদিন প্রধান বক্তা ছিলেন এবং তিনি নানা বিষয়ের কথা কহিয়া সকলের ভিতর উচ্চ ভাব আনাইয়া দিতেন। হরিমহারাজ তীর্থ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবার পুর্বে কালীবেদান্তী ও শরৎমহারাজ চা-পান মণ্ডলীর বিশেষ বক্তা ও উপদেষ্টা ছিলেন।

যদিও নিম্নলিখিত কথাগুলি সংক্ষিপ্তভাবে একবার বলা হইয়াছে কিন্তু হরিমহারাজের নরেন্দ্রনাথের প্রতি কি অবিচল অব্যভিচারিণী ভক্তি ছিল তাহার উদাহরণস্বরূপ এই গল্পগুলি প্রদত্ত হইল। হরিমহারাজের নরেন্দ্রনাথের কথা যে অভ্রান্ত এই ভাবটি তাঁহার ধারণা ছিল। নরেন্দ্রনাথ কোন্ গ্রন্থের উপর নিজের কি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন হরিমহারাজ সেইটি প্রামাণ্য বলিয়া মানিয়া লইতেন এবং বরাবর সেই মতটি রাখিতেন। যদিও তিনি নিজে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার নিজস্ব কিছু বলিতেন না। নরেন্দ্রনাথের কথা বেদবাণী এই তাঁহার ধারণা ছিল।

হরিমহারাজ মাইকেলের বড় ভক্ত ছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় মাইনর বা ছাত্র-বৃত্তির স্কুলে পড়িয়াছিলেন এইজন্য বাঙ্গালা সাহিত্য তিনি খুব ভালরূপে জানিতেন এবং মাইকেলের অনেক স্থান তাঁহার মুখস্থ ছিল। সেদিন তিনি উত্তেজিত হইয়াছিলেন এবং মাইকেল হইতে অনেক স্থান উদ্ধৃত করিয়া নিজের মত সমর্থন করিতে লাগিলেন।

বরাহনগরে প্রথম মঠ স্থাপিত হইলে নরেন্দ্রনাথ একদিন রামতনু

বসুর গলির বাড়িতে বসিয়া লক্ষ্মণের বিষয় বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "লক্ষ্মণের কি অকপট ভ্রাতৃপ্রেম। নিজে রাজার বেটা, ভোগ ঐশ্বর্যে মানুষ হয়েছে, রাম তার সতাতো ভাই, রাম বনে গেলে সে চাই কি রাজ্য পেতে পারত কিন্তু তার বড় ভাইয়ের প্রতি কি অচলা শ্রদ্ধা-ভক্তি! নিজের মা, নিজের বৌ, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সব ত্যাগ করে ছায়ার মত বড় ভায়ের সঙ্গে সঙ্গে চলল। বাপ তাকে তো তাড়ায় নাই; বড় বেটাকেই ত তাড়িয়েছিল কিন্তু লক্ষ্মণের বড় ভাইয়ের প্রতি ভালবাসাটাই তার আশ্চর্য জিনিস।" নরেন্দ্রনাথ সেদিন ভক্তিপূর্ণ ছিলেন সেইজন্য লক্ষ্মণের অনেক সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

হরিমহারাজ বলিতে লাগিলেন, "নরেন বলত যে সে রামায়ণ ও মহাভারতখানা একেবারে চুসে পড়েছে। একশ বছর পরে কি হবে সব যেন তার চোখের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্পষ্ট যেন ভবিষ্যৎ একশ বৎসর সে চক্ষে দেখতে পাচ্ছে।" তিনি মাঝে মাঝে নরেন্দ্রনাথের ন্যায় ঘাড় বাঁকাইয়া মুখভঙ্গি করিয়া নরেন্দ্রনাথের ভাব ও কথাবার্তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যাহারা বসিয়া শুনিতেছিল তাহারা, উচ্চভাব, হাস্যোদ্দীপক ভাষা শুনিয়া যেন নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি অনুভব করিতে লাগিল এবং হরিমহারাজের নরেন্দ্রনাথের প্রতি অসীম প্রগাঢ় ভালবাসা দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর মাতাকে কুকুরে কামড়ান—হরিমহারাজ অতুলবাবুদের প্রতিবেশী ছিলেন। বাড়ি কাছাকাছি। অতুলবাবু একদিন বৈকালবেলা তাঁহাদের ছাদে বসিয়াছিলেন, হন্যে কুকুর-শিয়ালের কামড়ানোর কথা উঠিল। উপস্থিত সকলে নানা রকম বলিতে লাগিলেন। অতুলবাবু বলিলেন, "দেখ, আমি চোখে একটা দেখেছি এই যে, হরির মাকে হন্যে কুকুর বা হন্যে শিয়ালে কামড়ায়। ক্রমেই কয়েকদিনের ভিতর বিষ ধরিতে লাগিল। জল দেখিলেই মহা আতঙ্ক হয়। অথচ জল-তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় জল খাওয়াতে গেলে জল দেখলে ভীষণ চীৎকার

করে, গলার আওয়াজ অতি বিকৃত হয়ে যায়। লোকে বলে শিয়ালে কামড়ালে শিয়াল ডেকে মরে, কুকুরে কামড়ালে কুকুর ডেকে মরে। হরির মার কী যন্ত্রণায় মৃত্যু হল।" হরি মহারাজের মায়ের মৃত্যুর কথা অনেকেই জানিত না, তজ্জন্য সকলেই স্তম্ভিত ও মহা দুঃখিত হইল।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর মনোবিজ্ঞানের কথা বলা—দর্শনশাস্ত্রে হরি-মহারাজ প্রগাঢ় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; প্রকৃতই তিনি যে শুধু উচ্চ স্তরের সাধক ছিলেন তাহাই নহে দর্শন শাস্ত্রেও তিনি অতি উচ্চ অবস্থার লোক ছিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে মনের গতির কথা উঠিল। হরিমহারাজ বলিলেন, "মনকে passive করবে না, মনকে active করবে।" উপস্থিত অনেক লোক এই কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। হরিমহারাজ তাই পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "জগৎটা হচ্ছে একটা মহাশক্তি, প্রত্যেক মানুষ, জীব, জন্তু যা কিছু দেখছ সবই সেই জগতের অংশ। প্রত্যেকটাই শক্তির রূপান্তর। অনবরত বাইরের শক্তিটা এসে নিজের মনকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। যখন বাইরের শক্তিটা বেশী হয় ও নিজের শক্তি কম হয় তখন মনটা passive হয়ে পড়ে। passive হলেই লোকটা জড়সড় জবু থবু হয়ে যায়, সে মনকে নিয়ে আর কিছু করতে পারে না—লোকটা যেন একেবারে মরে গেল। কিন্তু মনটাকে active রাখবে, জগৎ বা অপর বস্তু বা ব্যক্তি সম্মুখে আসলে তাকে passive করবে এবং নিজের মনকে active রাখবে; তা হলে দেখবে মনটা কিরূপ তর্ তর্ করে উপরে উঠে যায়।" হরিমহারাজ সে দিন মনের active ও passive ভাব লইয়া অনেক কথা কহিতে লাগিলেন এবং দর্শন শাস্ত্রের ও মনের কথা চলিতে লাগিল। active ও passive ভাবটা অতি গভীর দার্শনিক তত্ত্ব। বর্তমান লেখকের এই কথাটি বড় সুন্দর লাগিয়াছিল এবং ইহাতে হরিমহারাজের মনোবিজ্ঞানে কি গভীর জ্ঞান ছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তুরীয়ানন্দ স্বামী ও বর্তমান লেখক—একদিন প্রসঙ্গক্রমে বর্তমান

লেখক বলিলেন, "The greatest display of energy is to destroy the energy অর্থাৎ শক্তি দিয়ে শক্তিকে ধ্বংস করা এইটে হচ্ছে শক্তির বিশেষ বিকাশ।" হরিমহারাজ বলিলেন, "Energy cannot be destroyed অর্থাৎ শক্তিকে ধ্বংস করা যেতে পারে না তবে শক্তির গতি পরিবর্তন করে দেওয়া যেতে পারে। কথাটা হওয়া উচিত The greatest display of energy is to control the energy." কথাটা অতি সুন্দর, অতি ভাবপ্রদ এবং এই কথা লইয়া দর্শনশাস্ত্রে মনোবিজ্ঞানের অনেক সমস্যা মিমাংসা করা যায়।

দর্শনশাস্ত্রের কথা উঠিলে হরিমহারাজ ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু বলিতেন না। সেইটা যেন তাঁর স্বাভাবিক অবস্থা ও তাহাতেই যেন তিনি সব সময় ডুবিয়া বিভোর হইয়া আছেন। তিনি অনেক সময় আক্ষেপ করিয়া বলিতেন "আরে, শুনতে ক'টা লোক আসে, উপদেশ ঝাড়তেই লোক আসে। সেজন্য কখন কখন চুপ করে বসে থাকি নয়ত উঠে যাই।" তিনি উপনিষদ ও বেদান্ত এমন উচ্চভাবে সাধনা ও উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তিনি মূর্তিমান উপনিষদ হইয়াছিলেন। তাঁহার চলাফেরা, কথাবার্তা কণ্ঠস্বর বা চক্ষুর দৃষ্টি সবই অপর প্রকার ছিল। He was in the world but not of the world. প্রাচীন ঋষিরা কিরূপ হইত হরি মহারাজকে দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর জপ করা—জপ করা হরিমহারাজের যেন স্বাভাবিক অবস্থা। হরিমহারাজ ও রাখাল মহারাজের মত জপ করিতে অতি অল্প লোকই দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি যখন বেদান্ত বা অন্য কোন গ্রন্থ পড়িতেন তখন তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন কিন্তু অপর সময় পাছে কোন বেফাঁস কথা কানে আসে সেইজন্য তিনি অনবরত জপ করিতেন। যদি কেহ তাঁহার সঙ্গে সাধারণ ভাবে কথা কহিত তিনি সেই কথা বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু কথায় কিছু না বলিয়া তাহার দুই একটা কথায় হাঁ হুঁ দিয়া নিজে স্থির হইয়া বসিয়া জপ করিতেন। চক্ষু অন্তর্দৃষ্টি

হইয়া যাইত এবং নিজে স্থির ধীর হইয়া থাকিতেন। কাজেই পরে অযথা ভাষী লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া যাইত। জপ করাই যেন তাঁহার ধাতস্থ অভ্যাস। প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তিনি যেন জপ করিতেন। রাখালমহারাজ ও হরিমহারাজ যেন জীবন্ত মূর্তিমান জপ ছিলেন।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর নাগ মহাশয় সম্বন্ধে কথা বলা—হরিমহারাজ একদিন বলিতে লাগিলেন যে তিনি এক সময় পূর্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তারপর নাগ মহাশয়ের বাড়ি যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। খাওয়ার কথা উঠিলে নাগমহাশয় তাঁহাকে নিজের রান্না ঘরের ভাত দিতে বড্ড সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। নাগ মহাশয় বলিলেন, "তা কি হয় মশাই, আপনার গলায় পৈতা দেখেছি আমার স্মরণ আছে। তা কি করে আপনাকে শূদ্রের ভাতটা দেই", এই বলিয়া বিনীতভাবে অনেক কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। হরিমহারাজ নির্বিকার পুরুষ, তারপর নাগমহাশয় এত উচ্চ অবস্থার সাধক—হরিমহারাজের মনে কোন দ্বিধা হইতেই পারে না; কিন্তু নাগমহাশয় অতি দীনভাবে বিনয় সহকারে তাঁহাকে নিজের রান্নাঘরের ভাত খাইতে নিষেধ করিলেন। সেইজন্য অবশেষে হরিমহারাজ ও তাঁহার সঙ্গের লোকেরা নিজেরা পাক করিয়া খাইয়াছিলেন।

হরিমহারাজ নাগমহাশয়ের কথা কহিতে লাগিলেন। হরিমহারাজ নাগ মহাশয়ের জপ, ধ্যান, ঋজুভাব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস দেখিয়া অত্যন্ত মোহিত হইয়াছিলেন। নাগমহাশয়ের পিতা তখন জীবিত ছিলেন। হরিমহারাজ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, "আপনার পিতা ধন্য যাঁহার এমন মহাসাধক পুত্র হইয়াছে, আপনার পিতাও খুব জাপক, সর্বদাই জপ কচ্ছেন। যাহা হউক আপনারা পিতা-পুত্র মহাধন্য।" এই বলিয়া তিনি নাগমহাশয়ের পিতার ও নাগ মহাশয়ের অনেক সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় শুনিয়া বলিলেন, "ওতে আর কি কাজ হল? তিনি এখনও আমাকে ছেলে বলে স্নেহ মমতা করছেন, ঐত

বন্ধন হয়ে রয়েছে। ও হচ্ছে নঙ্গর ফেলে দাঁড় টানা নৌকা কি আর এতে এগুতে পারে? নঙ্গর তুলে নিয়ে দাঁড় টানলে তবে ত নৌকা এগোয়।" হরিমহারাজ বলিলেন, "আপনার মত উচ্চ অবস্থার ছেলেকে যদি ভাল না বাসবেন তবে জগতে কাকে বাসবেন?" নাগমহাশয় বলিলেন, "তা কি হয় মহাশয় ছেলে বলছেন আবার ভগবানে মন দিচ্ছেন; তাতে মনটা ঐখানে ত ভগবান থেকে তফাৎ হচ্ছে।"

হরিমহারাজ বলিতে লাগিলেন, "নাগমহাশয়ের এইসব কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া রহিলাম, কিছু আর জবাব করিবার রহিল না। মনে মনে কহিতে লাগিলাম কি উচ্চ অবস্থার হইয়া গিয়াছেন", এই বলিয়া হরিমহারাজ নাগমহাশয়ের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন।

তুরীয়ানন্দ স্বামী ও পূর্ণচন্দ্র ঘোষ—হরিমহারাজ তামাক বা চুরুট খাইতেন না। একবার তিনি সিমলা পাহাড়ে পূর্ণচন্দ্র ঘোষের বাসায় গিয়াছেন। পূর্ণবাবু সিমলা পাহাড়ের লোক, অনবরত চা ও চুরুট খাইতেন। পূর্ণবাবুর ধারণা ছিল যে হরি-মহারাজ তামাক খান। তাই পূর্ণবাবু হরিমহারাজকে গোটা কতক চুরুট দিয়া বলিলেন, "আপনি চুরুট খান পরে অন্য ব্যবস্থা করব।" পূর্ণবাবু বলিয়াছেন তাই হরিমহারাজ একটা চুরুট ধরাইয়া একটু একটু টানিতেছেন, কিন্তু অভ্যাস নাই। কড়া চুরুট তাই বড় কষ্ট হইতেছে। এমন সময় পূর্ণবাবু আসিয়া পড়িলেন। হরিমহারাজ পূর্ণবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "তোমার কথা মত এই চুরুট ধরাইয়া একটু টেনেছি আর পারছিনি।" পূর্ণবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি. কি তামাক খান না?" হরিমহারাজ বলিলেন, "না।" পূর্ণবাবু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, "চুরুট ফেলে দিন।"

হরিমহারাজের এইরূপ বালকের ন্যায় নির্বিকার ভাবের কথার অনেক উল্লেখ করা যাইতে পারে কিন্তু একটা উদাহরণই যথেষ্ট, সেইজন্য অপর সকল উদাহরণ দেওয়া হইল না।

তুরীয়ানন্দ স্বামীর নিকট নরেন্দ্রনাথের মত অভ্রান্ত—আলমবাজার

মঠে অনেক সময় দেখা যাইত যে হরিমহারাজ একটা সামান্য কথা তুলিয়া বলিতে বলিতে কথাটার মোড় ফিরাইয়া উঁচুদিকে লইয়া যাইতেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব চোখের জ্যোতিঃ, কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকিত। ক্রমেই কথা গভীর হইতে লাগিল এবং যতই কথাটা গভীর হইতে লাগিল ততই মাঝে মাঝে তিনি বলিতে লাগিলেন, "নরেন এই কথাটার এই বলিত, নরেন এই বলিত", বলিতে বলিতে যেন তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইতেছেন বা নরেন্দ্রনাথের কাছে তিনি বসিয়া আছেন এই ভাবটি প্রকাশ করিতেন। অপর লোকে যেমন শাস্ত্রের সামান্য বাণী তুলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন হরিমহারাজও সেইরূপ নরেন্দ্রনাথের উক্তি বা মত তুলিয়া নিজের ভাব সমর্থন করিতেন। কি অদ্ভুত শ্রদ্ধা-ভক্তি! হরিমহারাজের কাছে নরেন্দ্রনাথের মত্ অভ্রান্ত ছিল। দ্বিধাশূন্য হইয়া বুকে খুব জোর আনিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথের মত্ বলিতেন। ঠিক এই ভাবটা প্রকাশ করিতেন যে যদি জগতের সব মত্ এক হয় ও নরেন্দ্রনাথের মত্ অপর দিকে হয় তাহলেও নরেন্দ্রনাথের মত্ ঠিক। অপর মত্ ভ্রান্ত না হইলেও বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নয়। শেষ অবস্থাতে তাঁহার এই ভাবটা খুব প্রবল হইয়াছিল। নরেন্দ্রনাথ যা বলিয়াছেন তাহাই তাঁহার নিকট বেদবাক্য ছিল ইহাকেই বলে অব্যভিচারিণী ভক্তি।

বোম্বাইয়ে তুরীয়ানন্দস্বামী ও স্বামীজী— হরিমহারাজ একদিন বলিতে লাগিলেন যে নরেন্দ্রনাথের সহিত বোম্বাই অঞ্চলে কোন স্থানে দেখা হইল। তাঁহার কণ্ঠস্বর, মুখ ভঙ্গিমার সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অহঙ্কার, মান যশের বন্ধন হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন।

একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। নরেন্দ্রনাথ হরিমহারাজকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ হরি ভাই, ধর্ম কর্ম কিছু বুঝলুম না, ভগবানও কিছু পেলুম না, তবে একটা কিছু হয়েছে, বুকটার ভিতর বড় ভালবাসা বেড়ে গিয়েছে। জগতকে ভালবাসা দিতে ইচ্ছা করছে আর ত কিছু বুঝতে পারছি না," এইকথা বলিতে বলিতে হরিমহারাজের

মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। চক্ষু স্থির ও নিস্পন্দ হইতে লাগিল। নরেনন্দ্রনাথকে যেন সম্মুখে দেখিতে পাইতেছেন তাঁহার এইরূপ ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। আশে পাশের সকল লোক নিস্তব্ধভাবে একে একে সরিয়া যাইল পাছে হরিমহারাজের ভাবের ব্যাঘাত ঘটে।

স্বামীজী সম্বন্ধে তুরীয়ানন্দ স্বামীর মন্তব্য—চারুচন্দ্র দত্ত নামক জনৈক ব্যক্তি হরিমহারাজের খুব অনুগত ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি হরিমহারাজের কাছে যাইতেন। চারুবাবু এই গল্পটি বলিয়াছিলেন, হরিমহারাজের এক সময় বোম্বাই অঞ্চলের কোন অংশে নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নরেন্দ্রনাথ একটা বাগানে একটা গাছের তলায় খানকতক বই মাথায় দিয়ে বাঁ-পাশ ফিরিয়া মাটিতে শুইয়া আছেন। হরিমহারাজ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত পাঁচ রকম কথা কহিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ বললেন, "ভগবানকে ত দেখতে পেলুম না। অনেক ত বই ঘাঁটলুম কিছুই ত পেলুম না তবে বুকের ভিতর একটা কি হয়েছে। সেইটা আমাকে ঘুরাবার চেষ্টা করছে, আমাকে অস্থির করে তুলেছে।" চারুবাবু যেমন শুনিয়াছেন তেমনি বর্তমান লেখককে বলিতে লাগিলেন। হরিমহারাজ বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য! দেখলুম যেন সাক্ষাৎ শিব হয়ে শুয়ে আছেন আর মুখে বলছেন ভগবান দর্শন হল না, ধর্ম কর্ম কিছু বুঝতে পেলুম না। গরীব দুঃখীর দুঃখ কষ্টের যন্ত্রণা এইটাই তাঁহাকে উন্মত্ত করে তুলেছে।" হরিমহারাজ ঠিক এই ভাবে কথা বলিতে লাগিলেন, "শিব কি আর শিবকে দেখতে পান—শিব শিবই হন"।

আলমবাজার মঠে তীর্থ পর্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর সকলেই হরিমহারাজ ও রাখালমহারাজের ভিতর একটা বিশেষ ভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। হরিমহারাজ সারাদিনই জপ করিতেন এবং মাঝে মাঝে তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন। বেশ টের পাওয়া যাইত তিনি দেহের সম্বন্ধটা ত্যাগ করিয়াছেন বা উচ্চ একটা

ভূমিতে বসিয়া আছেন। আর যেন কথাবার্তা কহিতে পারিতেছেন না একেবারে বিভোর হইয়া গিয়াছেন। ইহাকেই বলে সবিকল্প সমাধি বা তুরীয় অবস্থা। তাঁহার নামও ছিল তুরীয়ানন্দ স্বামী। তিনি প্রকৃতই তুরীয় অবস্থাতে থাকিতেন।

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী ও হুদু মুখুজ্জে—একদিন গরমকালে, বিকেলবেলা শশীমহারাজ, হুদু মুখুজ্জে ও বর্তমান লেখক বাহিরের বড়ঘরের ছাদের উপর গিয়া বসিলেন। রাস্তার দিকে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ ছিল। গোটা কতক ডাল ছাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। শশীমহারাজ সেদিন খুব হর্ষিত ও উত্তেজিত, বুকে যেন তাঁহার সিংহ বিক্রমের শক্তি আসিয়াছে। হুদুমুখুজ্জেকে উপলক্ষ্য করিয়া শশীমহারাজ নরেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। শশীমহারাজ উত্তেজিত হইয়া মাথা ও বুক দৃঢ়ভাবে নাড়িতে নাড়িতে এবং ডান হাত ও অঙ্গুলী ভাবের অনুরূপ সঞ্চালন করিয়া উচ্চ ও গভীর গলা করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ মুখুজ্জে, নরেন আমাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ। তিনি বলে গিয়েছিলেন এই নরেনকে দিয়ে ঢের কাজ হবে। নরেনের কি বৈরাগ্য, কি জ্ঞান, কি তপস্যা, কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! অমন, জগতে খুব কম লোকের ভিতর দেখা যায়। তার ভালবাসা কি! অমন ভালবাসা জগতে দেখতে পাওয়া যায় না।" হুদু মুখুজ্জে দাঁত ফোক্‌লা বুড়ো। ২।১টা দাঁত ছিল, কথা কহিবার সময় জিভ বাহির হইয়া পড়িত। কোঙা হইয়া বসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, "হাঁ তাত বটেই, লরেন ত ভাল তা আগেই শুনতুম, তা লরেন ঢের রাজা চেলা করেছে। তা আমি গরীব—রাজাকে বলে আমাকে কিছু দিক না।" বর্তমান লেখকের ত হাসিতে হাসিতে পেট গুলিয়ে উঠল। শশীমহারাজ একভাবের কথা বলিলেন, হুদু মুখুজ্জে আর এক ভাবের কথা বুঝেছে। শশীমহারাজ হুদু মুখুজ্জের কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজের ভাবে উত্তেজিত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। হুদু মুখুজ্জে ত বসিয়া বসিয়া তার তসর কাপড়ের বিক্রীর কথা ভাবিতে লাগিল। এদিকেও প্রায়

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শশীমহারাজ চট্ করিয়া উঠিয়া আরতি করিবার জন্য নামিয়া যাইলেন। হুতু মুখুজ্জে সিঁড়িতে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল, "রামদত্ত, বইতে আমায় গাল দিয়েছে; আমি কি মামার সেবা করি নাই?" এই উপাখ্যানটি সামান্য হইলেও শশীমহারাজের নরেন্দ্রনাথের প্রতি কি জ্বলন্ত ভালবাসা ছিল তাহা প্রকাশ পায়।

এক সময় শরৎমহারাজ কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "নরেন একবার আমাদের বৌবাজারের বাড়িতে যায়। তখন নূতন, বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ছিল না। নরেন বাড়িতে ঢুকিয়াই বাড়ির সমস্ত ঘর বলে যেতে লাগল। আমি ত তাহার কথা শুনে অবাক! আমি নরেনকে বললাম, 'তুমি এ বাড়ির সমস্ত কথা কি করে জানলে? তুমি কি পূর্বে এ বাড়িতে এসে ছিলে?' নরেন কোন কথা কিছু স্পষ্ট বল্লে না কেবল গম্ভীর ভাবে 'আমি এসব জানি, এ আমার পূর্বে দেখা আছে।' কিন্তু কি ভাবে যে কথাটা বল্লে তা বুঝতে পারলুম না। ঘরগুলির বিষয় নরেন যা বলেছিল। তা সবই ঠিক মিলেছিল।"

ব্রহ্মানন্দ স্বামী—বাল্যকাল, অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ হইতেই রাখালমহারাজকে জপপরায়ণ ও ধ্যানী দেখা যাইত। যদিও অন্য বালকদের সহিত তিনি খেলাধুলা করিতেন কিন্তু একটু অবসর পাইলেই তিনি ধ্যান করিতেন এবং সর্বদাই কথাবার্তা ও কার্যে সংযত থাকিতেন যেন অপর কোন বালকের কোন বিষয়ে মনে কষ্ট না হয়। তখন তিনি সিমলাতে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে এই জপের ভাবটা তাঁহার খুব বাড়িতে লাগিল। বরাহনগর মঠের বাইরের ছোট ঘরে তিনি একাকী দরজার দিকে মুখ করিয়া একটা পটপটী চাটাইয়ে বসিয়া স্থির হইয়া জপ করিতেন। কাহারও সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা নাই। পাছে রাখালমহারাজ চঞ্চল হন এইজন্যে অপর কেহ কোন বিষয়ে তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতে বা গল্প করিতে আসিতেন না। নিশ্চল জীবন্ত বিগ্রহের ন্যায় তিনি এক মনে জপ

করিতেন। এইটি যেন তাঁহার ধাতস্থ অবস্থা ছিল। বলরামবাবুর বাড়িতে যখন থাকিতেন তখন বড় ঘরটির মেঝেতে বসিয়া তিনি এক মনে জপ করিতেন এবং জপ করিতে করিতে বিভোর হইয়া যাইতেন। মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টি একেবারে অন্য রকম হইয়া যাইত। পাছে তাঁহার জপের কোন বিঘ্ন হয় এইজন্য উপস্থিত ব্যক্তির ভিতর অনেকেই উঠিয়া বারান্দায় চলিয়া যাইতেন বা ছোট ঘরটিতে গিয়া বসিতেন। সকলেই অন্যত্র গিয়া বলাবলি করিতেন, "দেখছ রাখাল কি একমনে জপ করে! জমিদারের ছেলে বাড়ি ঘরদোর ত্যাগ করেছে, একমনে কিরূপ জপ কচ্ছে দেখছ? জপটাকে যেন আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে।"

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর জপ করা—কখন কখন দেখা যাইত যে রাখাল-মহারাজ বলরাম বাবুর বাড়ির রাস্তার দিকে বারান্দাতে বৈকাল-বেলায় পায়চারি করিতেছেন ও জপ করিতেছেন। কিন্তু এক একদিন এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যেন পায়ে আর জোর থাকিত না, ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িতেন। তিনি বারান্দাতেই হউক বা বড় ঘরের মেঝেতেই হউক জপ করিতে বসিলেই দেহ হইতে মনটা যেন অন্য স্থানে চলিয়া যাইত এবং বিভোর হইয়া জপ করিতেন বা ধ্যান করিতেন। সে সময় তাঁহার মুখের কান্তি চোখের দৃষ্টি অন্যরূপ হইত। যদিও অনেকে তখন সরিয়া যাইতেন কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিতেন। তখন তাঁহার এক অপূর্ব ভাব মুখে ফুটিত অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে মন চলিয়া যাইত।

নিরঞ্জনানন্দ স্বামী ও ব্রহ্মানন্দ স্বামী—বাংলার বাহিরে যখন রাখাল মহারাজ ছিলেন অর্থাৎ বৃন্দাবন, কুসুম সরোবর প্রভৃতি স্থানে তিনি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, মাধুকরী করিয়া খাওয়া, একখানা কম্বলে পড়িয়া থাকা আর চুপ করিয়া জপ করা। এই সময় তিনি যখন আবুপাহাড়ে যান তখন তাঁহার পাথুরী রোগ প্রথম দেখা দেয়। নিরঞ্জনমহারাজ এ সময় একবার পশ্চিমে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত রাখালমহারাজের আবুপাহাড় অঞ্চলে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

নিরঞ্জনমহারাজ ফিরিয়া আসিয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন, "ওহে রাখালের দেখলুম একেবারে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আগেকার রাখাল যেন আর নেই, অনবরত জপ করছে। তার কথাবার্তাও কি মিষ্টি হয়েছে। আবুপাহাড়ের কাছে দেখলুম যে তার পাথুরীর রোগ হয়েছে। পাথুরীর কি ভীষণ যন্ত্রণা। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে না বসতে পারছে না দাঁড়াতে পারছে। কিন্তু এত ধীর ও আত্মসংযমী যে মুখে তার কোন চাঞ্চল্যের ভাব নাই। অমন ভীষণ যন্ত্রণা চুপ করে সহ্য করে রয়েছে। কথাবার্তা গলার আওয়াজ কি মিষ্টি হয়েছে। রাখালকে দেখে বড্ড আহ্লাদ হল, তার অবস্থা এখন খুব উন্নত। তার উন্নত অবস্থা দেখে খুব আহ্লাদ হল।"

রাখালমহারাজের পাথুরীর অসুখ হইয়াছে এই কথা শুনিয়া সকলের মন একটু চঞ্চল হইল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন যে পাথরের দেশে থাকে কাঁকরওয়ালা রুটি ও ডাল মাধুকরী করে খায় তাহাতেই এই রোগটা হইয়াছে। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলার জল বাতাসে মানুষ হইয়াছে, ঝোল ভাত না খাইলে শরীর থাকে না। রাখাল যেন ফিরিয়া আসে। যাহা হউক রাখালমহারাজের পাথুরীর কথা শুনিয়া সকলেই একটু উদ্বিগ্ন হইলেন।

রাজপুতানা, কাথিওয়াড়, গুজরাট অঞ্চল ও বোম্বাই এই সকল স্থান দর্শন করিয়া তিনি আলমবাজার মঠে ফিরিলেন। আলম-বাজারের মঠে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বতন্ত্র লোক হইলেন। বরাহনগরের বিষণ্ণ হতাশ ভাবটা একেবারে চলিয়া গিয়াছে, বুকে যেন জোর আসিয়াছে এবং কথাবার্তা বেশ গম্ভীর হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর কার্যে মত দিবার নিয়ম—যদিও মাঝে মাঝে তিনি খুব হাসি তামাসা করিতেন কিন্তু সব সময় তিনি নিজেকে সকল কার্য হইতেই বিচ্ছিন্ন রাখিতেন কোন বিষয়ে তিনি লিপ্ত থাকিতেন না। স্বভাবসিদ্ধ জপ তাঁহার খুব বাড়িয়া গিয়াছে এবং মাঝে মাঝে জপে বিভোর হইয়া কোন একটা স্থানে চুপ করিয়া

বসিয়া পড়িতেছেন, এইরূপ বিভোর হইয়া সমাধিস্থ হওয়া যদিও রোজ হইত না কিন্তু প্রায়ই দেখা যাইত। কখন রাখালমহারাজ কথা কহিতে কহিতে আঙ্গুল নাড়িয়া জোর করিয়া বলিতেন, "এই কাজটা এই রকমে ঠিক হবে।" যদি কেউ জিজ্ঞাসা করিত যে, "রাখাল, তুমি কি করে বলছ এই কাজটা এই রকম করে হবে।" তখন তিনি তর্ক যুক্তির দিকে যাইতেন না। কখন কখন এই মাত্র বলিতেন "আমার মন এই কথা বলছে, আমার মন এই কথা বলছে, আমার ভিতর যেন এই কথা বলে দিল।" জিনিসটা প্রায়ই ঠিক হইত। ঠাকুরঘর বা বিশিষ্ট স্থানে বসিয়া তিনি জপ করিতেন না। জপ তাঁহার ধ্যানস্থ বা স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি যেখানে সেখানে বসিয়া জপ করিতেন, নির্দিষ্ট স্থানও ছিল না বা সময়েরও কোন স্থিরতা ছিল না।

ব্রহ্মানন্দ স্বামীর ঠাকুর ঘরে ঢুকিবার অমত—রাখালমহারাজ মঠের ঠাকুরের ঘরে বা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের শয়ন ঘরে যাইতে বড় সঙ্কোচ বোধ করিতেন। সাধারণ লোক অসংযত চিত্তে ঠাকুর ঘরে যাইয়া এদিক ওদিক মাথা ঘুরাইল ও তাহার পর চলিয়া আসিল। তাহাতে তাহাদের মনে যে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে তাহা প্রকাশ পাইত না। কিন্তু রাখালমহারাজের অন্য ভাব ছিল। তিনি বলিতেন, "তিনি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব) প্রত্যক্ষ ঘরে বসে আছেন আমি হট্‌ করে কি বলে যাই। লোকগুলোর মনের ভিতরে সেরূপ শ্রদ্ধা নাই তাই অমনি ফস্‌ করে ঠাকুর ঘরে গিয়ে বসল। জিনিসটির গুরুত্ব বোঝে না। অনেক অনুনয়ের পর শেষ কয়েক বৎসর ঠাকুরের তিথি পূজার দিন তিনি অতি সংযতভাবে বালকের ন্যায় বিনীত হইয়া ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া চামর দুলাইতেন এবং মিনিট কয়েক থাকিয়াই চলিয়া আসিতেন। বাহির হইবার সময় তাঁহার মুখের ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইত। দেহী অবস্থায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাইবার সময় যেমন তাঁহার মুখের ভাব হইত ঠিক সেই ভাবটি তখন তাঁহার মুখে ফুটিত। ইহাকেই বলে ঈশ্বর সান্নিধ্যজ্ঞান।

অনেক সময় দেখা যাইত জনকতক লোক আসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্তা বা গল্প করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রাখালমহারাজ অতি সংযত স্বভাব, কাহাকেও কখন রূঢ় কথা কহিতেন না। উপস্থিত গল্পে একটা কথা আরম্ভ করিয়া দিতেন আর লোকেরা আপনা-আপনি সেই কথা লইয়া বকিতে সুরু করিত আর রাখালমহারাজ নিজে স্থির হইয়া জপ করিতে থাকিতেন। লোকগুলি খানিকক্ষণ পর অপ্রস্তুত হইয়া উঠিয়া যাইত। কিন্তু ভবিষ্যতে তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ হইয়াছিল। আলমবাজারের মঠে এ বিষয় তেমন কিছু দেখা যায় নাই তবে তিনি যে উচ্চমার্গের সাধক সেইটাই দেখা যাইত। প্রকৃত রাখালমহারাজ ও হরিমহারাজ জীবন্ত জপ মূর্তি ছিলেন। এইরূপ মহাপুরুষদের মনোবৃত্তি ও মনের স্তরের উর্ধ্বগতি কেহই ভাষায় বলিতে পারে না। তবে বাহ্যিক আকার ইঙ্গিতে যাহা প্রকাশ পাইত সেটা মাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে এবং সেই বাহ্যিক ভাব লক্ষ্য করিয়া সাধকের উচ্চতর মনের গতি নিজে উপলব্ধি করিতে হয়। এ বিষয়ে আর কিছু বলা যায় না।

ডেট্রয়েটে স্বামীজীর বক্তৃতা—বক্তৃতা কোম্প্রানীর সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া স্বামীজী স্বাধীনভাবে বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা বা ক্লাশ করিয়া উপদেশাদি দিতে লাগিলেন। এক বৎসরের ভিতর সমুদয় প্রদেশের প্রত্যেক প্রধান প্রধান সহরে ঘুরিয়া অসংখ্য বক্তৃতা দিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সময়কার কার্যাবলীর বিশেষ বিবরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। ডেট্রয়েটে প্রায় একমাস তিনি মিচিগানের ভূতপূর্ব গভর্ণর জন. এইচ. ব্যাগলি মহোদয়ের বিধবাপত্নীর গৃহে অতিথি ছিলেন। এই মহিলা প্রায় বলিতেন, "এইকালে স্বামীজীর মুখে যে সব কথা শুনিতে পাওয়া যাইত তাহাতে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান নিহিত ছিল। তাঁহার পবিত্র, সৌম্যমূর্তি ও সারগর্ভ উপদেশাবলী যেন জগদীশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ মনে হইত।" ডেট্রয়েটের 'ইউনিটেরিয়ান চার্চে' কতকগুলি ক্রমিক বক্তৃতা দিবার পর তিনি চিকাগো, নিউইয়র্ক ও বোষ্টনে অতিবাহিত করিলেন। তাহারপর

নিউইংলণ্ডের অন্তর্গত গ্রীনএকার (Greenacre) নামক স্থানে বক্তৃতা দেন। এখানে জনকতক আগ্রহশীল ছাত্র জুটিয়াছিল। তাহারা একটি প্রাচীন দেবদারু বৃক্ষের নীচে আসন পিঁড়ি হইয়া বসিয়া স্বামীজীর মুখে বেদান্ত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছিল তদবধি ঐ বৃক্ষটিকে 'স্বামীজীর দেবদারু' বৃক্ষ বলিয়া সকলে অভিহিত করিয়া থাকে।

গ্রীন্‌একারের কার্য শেষ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বোষ্টন, চিকাগো ও নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে ও আশেপাশে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইযাছিল। ব্রুকলিনে স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া 'ব্রুকলিন ষ্ট্যাণ্ডার্ড' সংবাদ পত্র লিখিয়াছিল "...আচার্য বিবেকানন্দ প্রকৃতই একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর লোক। এমন কি, লোকের মুখে যাহা শুনিতে পাওয়া যায় তিনি তাহা অপেক্ষাও মহত্তর।"

নিউইয়র্কে স্বামীজীর বক্তৃতা—১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে নিউইয়র্কে ধারাবাহিক বক্তৃতার সূত্রপাত হইল। এইখান হইতে স্বামীজী নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা দেওয়া পরিত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে একটি বাসা লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া একজন বিখ্যাত লেখক লিখিয়াছেন,..."তাঁহার বক্তৃতাশক্তি এতদূর বিস্ময়কর যে তদ্দর্শনে শ্রোতৃবর্গের অন্তস্থল ভেদ করিয়া স্বতঃই এই কথা নিঃসৃত হয়, দেবতার বরে এরূপ অপূর্ব বাগ্মিতার অধিকার জন্মিয়াছে।" সুবিখ্যাত নিউইয়র্ক ক্রিটিক লিখিয়াছিল, "......সভা সমিতি ও ধর্মমন্দিরে বহুবার তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার ধর্মমতের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইয়াছে এবং তাঁহার বিদ্যা বাগ্মিতা ও মধুর ব্যবহার দর্শনে 'হিন্দুসভ্যতা' সম্বন্ধে নূতন ধারণা জন্মিয়াছে।"

পাদ্রীদের সম্বন্ধে স্বামীজীর মত—একদিকে যেমন স্বামীজীর প্রশংসা ও সম্মান চতুর্দিকে বৃদ্ধি পাইতেছিল অন্যদিকে আবার তেমনি পাদ্রীর দল তাহার উপর বিশেষ ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দর্শনে গোঁড়া ক্রিশ্চানরা নিজেদের স্বার্থহানির সম্ভাবনা দেখিয়া নানা প্রকারে বিরুদ্ধাচরণ করিতে

লাগিল। স্বামীজী তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে পরে তাঁহার এক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, "লোকে যখন আমায় খাতির করতে লাগল তখন পাদ্রীরা আমার পেছনে খুব লাগল। আমার নামে কত কুৎসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কতলোক আমায় তার প্রতিবাদ করতে বলত। আমি কিন্তু কিছু গ্রাহ্য করতুম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চালাকি দ্বারা জগতে কোনও মহৎ কার্য হয় না; তাই ঐ সকল অশ্লীল কুৎসায় কর্ণপাত না করে ধীরে ধীরে আপনার কাজ করে যেতুম। "কি জানিস বাবা, সংসারে সবই দুনিয়াদারী। ঠিক সৎ, সাহসী ও জ্ঞানী কি এ সব দুনিয়াদারীতে ভোলেরে বাপ্। জগৎ যা ইচ্ছে বলুক, আমরা কর্তব্য কার্য করে চলে যাব—এই জানবি বীরের কাজ। নতুবা এ কি বলছে ও কি বলছে এ সব নিয়ে দিনরাত থাকলে জগতে কোন মহৎ কাজ করা যায় না।"

স্বাধীন চিন্তাশীল সম্প্রদায় ও স্বামীজী—খৃষ্টান পাদ্রীদের অপেক্ষাও একদল যোগ্যতর প্রতিদ্বন্দ্বী স্বামীজীর বিরুদ্ধে লাগিয়াছিল। তাহারা সাধারণতঃ 'Free thinkers' বা স্বাধীন-চিন্তাশীল সম্প্রদায় নামে অভিহিত। নিরীশ্বরবাদী, জড়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, যুক্তিবাদী প্রভৃতি ধর্মের বিরোধী সকল শ্রেণীর লোকই এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। তাহদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাহারা তর্ক যুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্বারা অতি সহজেই ধর্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবে এবং সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া স্বামীজীকে একদিন তাহাদের সভাগৃহে নিমন্ত্রণ করে। স্বামীজী তথায় উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিত ঘোর তর্ক চলিল। কিছুক্ষণ তর্ক করিবার পর তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিল। স্বামীজীর সহিত স্বদলবলে তর্ক করিয়া তাহারা বুঝিয়াছিল যে ইনি যে শুধু ধর্মের উপদেষ্টা তাহা নয় জড় জগতের সমস্ত তর্ক যুক্তি ইহার নখাগ্রে। ফল এই হইল যে যাহারা তর্ক করিবার জন্য সাজিয়া আসিয়াছিল তাহারাই পরদিন হইতে তাঁহার নিকট ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় উপদেশ লাভ প্রার্থনা করিতে লাগিল।

নিউইয়র্কে স্বামীজী যে ক্লাশ খুলিয়াছিলেন তাহাতে প্রধানতঃ

রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজযোগের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা জোর দিতেন ধ্যানের উপর। তিনি যে শুধু যোগ-মার্গে তত্ত্ব উপদেশ দিতেন তাহা নহে কেমন করিয়া তাহা সাধন করিতে হয় স্বয়ং কার্যে দেখাইতেন। তিনি শিষ্যদিগকে সর্বদা বলিতেন, "শুধু এক বস্তুর অনুসন্ধান কর—ঈশ্বর।" এই সময় মিসেস্ ওলীবুল, ডাক্তার এলান ডে, মিস্. ই. ওয়াল্ডো, প্রোঃ ওয়াই ম্যান, প্রোঃ রাইট, ডাঃ ষ্ট্রীট, অভিনেত্রী সারা বার্ণহার্ড ও মাদাম কাল্‌ভে প্রভৃতি তাঁহার সহিত পরিচিত হন।

স্বামীজীর লণ্ডনে গমন ও বক্তৃতা দেওয়া—সহস্র-দ্বীপোদ্যান হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজী প্যারী হইয়া লণ্ডনে গমন করেন। প্যারীতে তিনি নানা স্থান দেখিয়া লইলেন। লণ্ডনে আসিয়া স্বামীজী ই. টি. ষ্টার্ডির বাড়িতে কয়েক দিন থাকিয়া ধীরে ধীরে কার্য আরম্ভ করেন। প্রথমবারে লণ্ডনে গিয়া স্বামীজী বিশেষভাবে কিছু কার্য করেন নাই। যাহা হউক স্বামীজীকে দেখিবার ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু সম্ভ্রান্ত লোক নিত্য আসিতে লাগিলেন। ষ্টার্ডি সকলের সহিত স্বামীজীর আলাপ পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলেন। স্বামীজী পিকাডিলিস্থ 'প্রিন্সেস্ হল' নামক বাটিতে প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা দিলেন। বিষয়—আত্মজ্ঞান। এই বক্তৃতা-ক্ষেত্রে লণ্ডনের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্র লিখিল,—"রাজা রামমোহন রায়ের পর কেশবচন্দ্র সেন ব্যতীত ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট বক্তা আর কখনও ইংলণ্ডের বক্তৃতামঞ্চে দৃষ্ট হয় নাই।"

স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন—বহু সংবাদ পত্র স্বামীজীর সুখ্যাতি করিয়া লিখিতে লাগিল। এই সময় সিষ্টার নিবেদিতা স্বামীজীর দর্শন লাভ করেন। লণ্ডনে তিনমাস সামান্য কার্য করিয়া সেবার স্বামীজী আমেরিকায় ফিরিয়া যান। স্বামীজী আমেরিকায় ফিরিয়া যাইয়া কর্মযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া 'দি হাট্-ফোর্ড ডেলী টাইমস্' লিখিয়াছিল,—"এঁর কথাবার্তা আজকালকার নামসর্বস্ব খৃষ্টানদের মত নয় বরং অনেকটা খৃষ্টেরই মত। তাঁহার উদার ভাব সকল ধর্ম ও সকল জাতির প্রতি ব্যাপ্ত। তাঁহার উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবের কথাগুলি যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে।" এই সময় স্বামীজীকে বক্তৃতা দিবার জন্য নানাস্থান হইতে নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল ও লোকে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া প্রাণে শান্তি পাইতে লাগিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বামীজী বক্তৃতা বন্ধ করিয়া স্থায়ীভাবে বেদান্ত প্রচারের জন্য 'নিউইয়র্ক বেদান্ত সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। ইত্যবসরে স্বামীজীর রাজযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ নামক তিনখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল। এইরূপে আমেরিকায় বেদান্তের ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বামীজী ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল দ্বিতীয়বার লণ্ডনে স্থায়ীভাবে কার্য করিবাব জন্য আমেরিকা পরিত্যাগ করিলেন।*

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শিব ওঁ।

---

* স্বামীজীর জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী গ্রন্থকার রচিত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" দ্রষ্টব্য।

॥ মহেন্দ্র-বাণী ॥

(প্রশ্ন) স্বামীজী কোন্‌খানে জন্মে ছিলেন ?

(উত্তর)—জন্মস্থান দিয়ে কি হবে ? এক ঢং হয়েছে—খালি জন্মস্থান। লোকটা কি করলে, কি ভাবলে, কি চিন্তা করলে, কি করে জীবন দিয়ে গেল, তার দিকে কোন কথা নেই—জন্মস্থান ? জন্মস্থান আর মাটি মাটি করলে মাটি হয়ে যাবে। Idea আসল Idea ধর Idea নিয়ে থাকগে। জাতের center হচ্ছে—Bread Medicine and Education.

"কথাপ্রসঙ্গে—শ্রীমহেন্দ্রনাথ", ১৩৮ পৃষ্ঠা

এতাবৎকাল ভারতবর্ষে মন্দির, বিগ্রহ ও তীর্থ পূজা হইয়া আসিতেছে। এই ব্যাপারে সমস্ত ভারতবর্ষে কোটি কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা নিশ্চয় ভক্তির নিদর্শন তাহাতে কোন্ সন্দেহ নাই ; কিন্তু নিকটবর্তী স্থলে যদি কোন ব্যক্তি বিপন্ন হয় ও অন্নক্লিষ্ট হয়, তাহার দিকে কেহই চাহিয়া দেখে না। প্রশ্ন করিলে উত্তরে বলে, ওর প্রাক্তন কর্মফল ভোগ করছে। তাতে আর কে কি করবে বল ? কেহ বলেন, অদৃষ্টে যা লেখা আছে তা' আর কে খণ্ডন করবে বল ? সুকর্ম করলে সুখী হত—দুষ্কর্ম করেছে, দুঃখ ভোগ করছে।" এইটি হইল সাধারণ লোকের ভিতর প্রচলিত মনোভাব। ঠাকুর দেবতার প্রতি যথার্থই শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে ; কিন্তু মানুষের প্রতি ভালবাসায় সে প্রাণ একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে—অযথা দার্শনিক মত উদ্ধৃত করিয়া নানারূপ শুষ্ক তর্ক বিতর্ক করেন। এই হইল জনসাধারণের ভিতর ধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত মনোভাব।

"স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান" ১০৯/১১০ পৃষ্ঠা

যে ভিতরটা লুকিয়ে রেখে বাইরে ভক্তগিরি দেখায়, তার হয় না। ভিতরটা কদর্য হলেও হয়, যদি সরল হয়। কিন্তু সাধুগিরি ভক্তগিরিতেও হয় না, যদি কপট হয়। কপটের মুক্তি নেই।

"কথাপ্রসঙ্গে—শ্রীমহেন্দ্রনাথ"—১৩৫ পৃষ্ঠা

পূর্বকালে ইষ্ট আর পূর্ত দুইটি শব্দের প্রচলন ছিল। ইষ্ট অর্থে ঈশ্বর লাভার্থ প্রয়াস—বেদপাঠ, হোম, যজ্ঞাদি আর পূর্ত অর্থে পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষাদি রোপণ, পান্থশালা স্থাপন ইত্যাদি। আধুনিক ভাষায় ধর্ম ও কর্ম। স্বামীজী এই ভাবটি পরিবর্তন করিয়া নূতন ভাব সৃষ্টি করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন—ইষ্টই পূর্ত এবং পূর্তই ইষ্ট। ধর্মই কর্ম এবং কর্মই ধর্ম। কর্মেতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ এবং কর্মেতেই মুক্তি। তিনি বহুবার বলিয়াছেন যে, ভারতে ধর্ম আছে, ভারতে ভক্তি আছে কিন্তু প্রাণহীন। ইহাতে প্রাণসঞ্চার করা আবশ্যক। কর্মের ভিতর দিয়া ধর্মকে দেখান চাই। প্রত্যেক কর্মই ধর্ম। প্রত্যেক সেবাই নারায়ণ সেবা, এই বীজমন্ত্র তিনি প্রণয়ন করিলেন।

* * *

স্বামীজী কেবলই বলিতেন—জীবসেবা এই যুগের প্রধান সহায়। নিরাশ্রয়দিগকে আশ্রয় দিবে, শোকার্তদিগকে সান্ত্বনা দিবে ; এবং সুষুপ্ত দেবভাব তাহাদিগের ভিতর জাগ্রত করিয়া দিবে। ইহাই হইতেছে দেশের কল্যাণকর পন্থা।

"কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ", ৫১ ও ৫৪ পৃঃ

কয়েকখানি গ্রন্থ পড়িয়া ও প্রসিদ্ধ লোকের বাণী উল্লেখ করিয়া শ্রোতাকে বিমুগ্ধ ও বিভ্রান্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, সেই ব্যক্তি কি শান্তি পাইয়াছে ? দু'চারখানি বই না পড়িলে কি শান্তি আসে না ? বড় বড় কথা উদ্ধৃত না করিতে পারিলে কি শান্তি পাওয়া যায় না ? এই স্থানে তর্ক যুক্তির কোন স্থান নাই, বিদ্যা-বুদ্ধির কোন গন্ধ পর্যন্ত নাই। পাণ্ডিত্যের কোন রেখা নাই—ইহা এক স্বতন্ত্র বস্তু এবং অপর সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শান্তি বা ব্রহ্মলাভে সকলেরই অধিকার আছে। পথ কাহারও জন্য বন্ধ নহে। পথ সকলেরই জন্য সব সময় খোলা। প্রবল ইচ্ছা থাকিলে এবং নিষ্ঠার সহিত চেষ্টা করিলে সকলেই গন্তব্যস্থানে যাইতে পারে। এই স্থলে উচ্চ বর্ণ ও নিম্নবর্ণের ভেদ হেতু কিছুই আসিয়া যায় না।

শান্তি বা ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত জাতি-বর্ণ, বংশ-মর্যাদা ও বিদ্যা বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই এবং হীন অবস্থার লোকও শান্তি বা ব্রহ্মলাভ করিতে পারে। 'ব্রজধাম দর্শন'। ৫৬ পৃষ্ঠা

শ্রদ্ধাই হইল উচ্চমার্গে যাইবার প্রধান দ্বার বা রাজপথ। গুরু শিষ্যকে অপর সব ভাব দিতে পারেন কিন্তু শ্রদ্ধা দিতে পারেন না। শ্রদ্ধা না থাকায় শিষ্যদিগের ভিতর পার্থক্য হইয়া যায়। ইহা হইল ব্যক্তির নিজস্ব গুণ। ইংরাজীতে ইহাকে Personal Attachment বলে। ইহাই হইল উচ্চজীবন লাভের মূল উপাদান। গুরু উপদেশ দিয়া এইরূপ উর্বরভূমিতে বহুবিধ ফসল উৎপন্ন করিতে পারেন। আপনি কৃপা করে শ্রদ্ধাটা দিয়ে দিন—এই রকম বচন কেবল কুড়েমির লক্ষণ। যে সকল লোক অলস, অকর্মণ্য তমোগুণে আচ্ছন্ন তাহারই কেবল এইরূপ কথা বলিয়া থাকে এবং তাহাদের বিশেষ কিছু উন্নতিও হয় না। চলিত কথায় বলে, 'হয় কি কখন হয় পিটাইলে গাধা ?' ভিতরে একটি ওজোভাব থাকা আবশ্যক, তাহা হইলে গুরুর উপদেশ প্রতিফলিত হইতে পারে।

'তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান'। ৩১ পৃষ্ঠা

সাধারণ লোকে মহাপুরুষদের···অদ্ভুত কার্যাবলী দেখিয়া লাভ ও লোকসানের হিসাব করিয়া থাকে, কৃতকার্যতা ও অকৃতকার্যতার কথা—জয় পরাজয়ের কথা কহিয়া থাকে; কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে পরিণামে এই সকল মহাপুরুষেরাই বিজেতার গৌরব মুকুট মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। সাধারণ লোকে বুঝে না—Apperent success is real failure and apperent failure is real success. দৃশ্যতঃ যাহাকে "কৃতকার্যতা" বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাই প্রকৃত "অকৃতকার্যতা" এবং যাহাকে "অকৃতকার্যতা"। বলিয়া বোধ হইতেছে তাহাই প্রকৃত "কৃতকার্যতা"। তত্ত্বদৃষ্টিহীন সাধারণ লোক ইহার বিপরীতই বুঝিয়া থাকে। যাহা "কৃতকার্যতা" তাহাকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকে এবং যাহা "অকৃতকার্যতা" তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। জীবনের ইহাই মহা

সন্ধিক্ষণ। এই মহা সন্ধিক্ষণ সকলের জীবনেই আসিয়া থাকে— প্রকৃতকে অপ্রকৃত বলিয়া বুঝা—সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝা। জগৎ যাহাকে সত্য বলিতেছে তাহা আমার কাছে মিথ্যা এবং আমি যাহাকে সত্য বলিতেছি তাহা জগতের কাছে মিথ্যা—কি কর্তব্য? এই সন্ধিক্ষণেই মহৎ লোকের মহত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বীর হৃদয়েব বীরত্বের নিদর্শন এখানেই পাওয়া যায়। একদিকে সমগ্র জগত ও তাহার প্রতিকূল অবস্থা—অপরদিকে জীবনের আদর্শ। কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—লক্ষ্য আদর্শের দিকে। আপাততঃ প্রতীয়মান কৃতকার্যতা বা জয়ের দিকে লক্ষ্যই নাই—লক্ষ্য আদর্শের দিকে। জগত সমর্থন করুক বা না করুক তাহাতেও কিছু আসিয়া যায় না। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাঁহার জন্য তাঁহাদের জীবন পণ। সেই জন্য দেখি ক্রুশ বিদ্ধ খৃষ্টের মস্তকে আজ স্বর্ণ-মুকুট, বোধিদ্রুম ছায়ায় "পাংশু-পিশাচ" বুদ্ধের চরণে আজ শুভ্র কমলের অর্ঘ, নদীয়ার উন্মাদ নিমাই আজ সর্বজনপূজ্য প্রেমের রাজা, আর দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর পাগ্‌লা বামুনের বাণী শুনিবার জন্য সমগ্র জগৎ আজ উৎসুক ও শ্রদ্ধাবনত। কত শত না প্রচণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটের হীরক খচিত মুকুট মস্তক হইতে খসিয়া পড়িল, তাঁহাদের রত্নসিংহাসন টলিয়া যাইল—পৃথিবীর বুক হইতে তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইল। জনসাধারণ ভাবিয়াছিল তাঁহাদের প্রতাপ অজেয়, তাঁহাদের সাম্রাজ্য কালজয়ী। সে সকল আজ কোথায়? এই জন্য বলিতেছি ধ্রুব, পরিণামে এই সকল মহাপুরুষেরাই বিজেতার গৌরব-মুকুট মস্তকে ধারণ করেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় তাঁহারা অনেক সময় সম্মান পান না, কিন্তু আদর্শের প্রতি অনুরাগ—সত্যনিষ্ঠা জগতে চিরকাল আদর্শ স্থল হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে আপামর এইরূপ জীবন্ত আদর্শ দেখিয়া, দৃঢ়চিত্ত ও সত্যনিষ্ঠ হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে জীবন পথে অগ্রসর হইবার অফুরন্ত সাহস ও বল পাইয়া থাকে। মৃত্যুঞ্জয়ী তাঁহারা—নিজেরা তো মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেনই—অপরকেও তাঁহারা মৃত্যুকে জয় করিবার শক্তি দিয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে ইহাই দেখিতে পাই। "শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান"/১৪২/৪৩ পৃষ্ঠা

সাধারণ জীবের সংসার ও জগতের উপর অতীব অনুরাগ থাকে। তাহারা মনে করে—'আমরা মনের শক্তি দিয়া সংসারের দ্রব্যাদি জয় করিব বা দ্রব্যাদির আরও বৃদ্ধি করিব।' পক্ষান্তরে হইাও দেখা যায় যে সংসারের দ্রব্যাদিই তাহাদের মনকে জয় করিয়াছে। দার্শনিক ভাবে দেখিতে হইলে ইহা বলা যায়, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে মন দিয়া জগতের দ্রব্যাদি আয়ত্তাধীনে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে অর্থাৎ সংগ্রহ করিয়াছে, জগতের দ্রব্যাদিও অন্যরূপে সেই পরিমাণে তাহার মন অধিকার করিয়াছে। I posses the objects, the objects possessing my mind—আমি দ্রব্য অধিকার করিতেছি, দ্রব্যও আমার মনকে অধিকার করিতেছে। এমনকি, অনেক সময় পার্থিব দ্রব্যাদি প্রায় সমস্ত মনটাকে অধিকার করিয়া ফেলে। এইজন্য দ্রব্যাদির উপর তাহাদের এত আকাঙ্ক্ষা ও লিপ্সা। এরজন্যই এই সকল ব্যক্তিরা কোন উচ্চতর চিন্তা করিতে পারেনা এবং উচ্চ চিন্তার কথা শুনিলেই তাহাদের প্রাণে ভয় হয়। পার্থিব কয়েকটি মনোনীত বস্তুর বাহিরে যে জগৎ বলিয়া কিছু একটা আছে বা চিন্তা করিবার কিছু বিষয় আছে এ-সকল ভাব তাহারা আদৌ কল্পনায়ও আনিতে পারে না। পার্থিব বস্তুতে তাহাদের অতীব লিপ্সা থাকায় তাহারা অত্যন্ত জড়িত হইয়া পড়ে। বস্তুর কিছুমাত্র বিপর্যয় হইলে তাহারা একেবারে চিন্তিত, বিষণ্ণ ও শোকার্ত হইয়া থাকে। স্বর্গ, ব্রহ্ম ইত্যাদি তাহারা ঈপ্সিত কয়েকটি মাত্র বস্তুর ভিতর দেখে। এতদ্ব্যতীত মোক্ষ, মুক্তি, ব্রহ্ম ইত্যাদি কোন ভাবই তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। এইটি হইল সাধারণ লোকের ভাব।

"স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান।" ৬৪ পৃষ্ঠা

এখনকার দিনে মন্দিরের কোন আবশ্যক নাই। জাতির যাহাতে উন্নয়ন হইতে পারে এইরূপ কার্য করা আবশ্যক।।

—"পশুজাতির মনোবৃত্তি" ৬৬ পৃষ্ঠা

Books by Sri Mohendra Nath Dutt

ENGLISH

Religion Philosophy, Psychology	Price
1. Energy	4·00
2. Mind	10·00
3. Mentation	2.50
4. Theory of Vibration	2·50
5. Cosmic Evolution—Part II	4·00
6. Triangle of Love	2·00
7. Formation of the Earth	2.50
8. Metaphysics	2·50
9. Theory of Motion	2.50
10. Biology—Paper bound	7·00
11. Logic of Possibilities	4·00
12. Devotion	4·00
13. Ego	6·00
14. Theory of Sound	3·50
15. Theory of Light	5·00
16. Ethics	3·00
17. Thoughts on Religion	4·50
*18. Natural Religion	—
*19. Cosmic Evolution—Part I	—
Art & Architecture	
1. Dissertation on Painting	4·00
*2. Principles of Architecture	—
Literary Criticism, Epic etc.	
1. Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra	1·50
2. (a) Language and Grammar & (b) Rhetoric	10·00
3. Nala and Damayanti	5·00
*4. Krukshetra	—

* Book marked with asterisks are out of print.

Social Sciences

1.	Lectures on Status of Toilers	2·50
2.	Homocentric Civilization	2 50
3.	Reflections on Society	2 00
4.	Federated Asia	4 50
5.	National Wealth	5·50
6.	Nation	2 00
7.	New Asia	3·00
8.	Action	3·00
9.	Society	5 00
10.	Temples and Religious Endowments	1·50
11.	Toilers Republic	0 50
12.	Society and Education, Woman and Education	4 00
*13.	Lectures on Education	—
*14.	Status of Women (with Bengali Translation)	—
*15.	Refilections on woman (Published by Saradeswari Ashram)	
*16.	Rights of Mankind	—
*17.	Social Thoughts	—

HINDI

1.	Nari Adhikar (Translation of "Status of Women")	0·75
2.	Manab Kendrik Sabhyata (Translation of Homocentric Civilization)	1·00

Awaiting Publications

1. Dissertation on Poetry
2. Lectures on Philosophy

বাংলা

অনুধ্যান, দর্শন প্রভৃতি		মূল্য
১।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান	১০·০০
২।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ ১ম খণ্ড	৮·০০
৩।	লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ, (২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে)	১৫ ০০
৪।	শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী ১ম খণ্ড,	১৫·০০
৫।	ঐ ২য় খণ্ড,	১০·০০
৬।	ঐ ৩য় খণ্ড	১০·০০

৭।	স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যজীবনী	৩·৫০
৮।	কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ	৪·০০
৯।	শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী	১৩·০০
১০।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান	২·০০
১১।	তাপস লাটু মহারাজের অনুধ্যান	৩·৫০
১২।	মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	৮·০০
১৩।	অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	৮·০০
১৪।	সাধুচতুষ্টয় (সারদেশ্বরী আশ্রম কর্তৃক প্রকাশিত)	—
১৫।	জে. জে. গুডউইন (স্বামীজীর ক্ষিপ্র লিপিকার)	৩·০০
১৬।	নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	২·০০
১৭।	ব্রজধাম দর্শন	৩·৫০
১৮।	প্যালেস্টাইন ভ্রমণকাহিনী ও ইহুদী জাতির ইতিহাস	১·৫০
১৯।	বদরীনারায়ণের পথে	৮·০০
২০।	মায়াবতীর পথে	১·৫০
২১।	ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন	২·৫০
*২২।	ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ	—
*২৩।	দীন:মহারাজ	—
*২৪।	গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ)	—
*২৫।	গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান	—
*২৬।	মাতৃদ্বয় (গৌরী মা ও গোপালের মা)	—
*২৭।	মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম)	—

কাব্য সমালোচনা প্রভৃতি

১।	পশুজাতির মনোবৃত্তি	১.০০
২।	পাশুপত অস্ত্রলাভ (কাব্য)	৫·০০
৩।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	
৪।	সঙ্গীতের রূপ	১·৫০
৫।	নৃত্যকলা	১·০০

* তারকা চিহ্নিত পুস্তকগুলি বর্তমানে পাওয়া যায় না।

৬। দৌত্যকার্য — ৬.০০
৭। বিবিধ কবিতাবলী — .৫০
৮। কাব্য অনুশীলনী — ১.০০
৯। কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা — ৬.০০
১০। প্রাচীন জাতির দেবতা ও বাহনবাদ — ৩.০০
*১১। বাংলা ভাষার প্রধাবন — —
*১২। শিল্প প্রসঙ্গ — —
*১৩। খেলাধুলা ও পল্লীসংস্কার — —
*১৪। বৃহন্নলা (কাব্য) — —
* ১৫। প্রাচীন ভারতের সংশ্লিষ্ট কাহিনী — —
* ১৬। উষা ও অনিরুদ্ধ — —

নিম্নের গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া মহেন্দ্র দর্শনের ভূমিকায় পরিচিত হউন।

১। স্মৃতি তর্পণ—শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত — ৩.৫০
*২। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমহেন্দ্রনাথ—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ঘটক প্রণীত — —
৩। স্মৃতি-কথা—শ্রীসাতকড়ি মিত্র প্রণীত — ১.২৫
৪। আমার দেখা মহিমবাবু—শ্রীরঘুনাথ বসু প্রণীত — ১.০০
৫। বিবিধ প্রসঙ্গে মহেন্দ্রনাথ—শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত — ২.৫০
৬। শতবার্ষিকী লেখমালা — ৫.০০
৭। পুণ্যদর্শন মহেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে—শ্রীসত্যচরণ দত্ত প্রণীত — ৩.০০
*৮ সংলাপে শ্রীমহেন্দ্রনাথ ১ম খণ্ড } শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত — —
২য় খণ্ড — ১০.০০
৯। মহেন্দ্র তিরোধান } শ্যামাপদ পাল প্রণীত — ২.০০
১০। অঞ্জলি নিবেদন— — ২.৭৫
১১। স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান সমাজ — ২.০০